ভূ-স্বর্গে বিদ্রোহ
ইতিহাস ও প্রেক্ষিত

মুহাম্মদ ফারুকে আজম চৌধুরী

www.pathagar.com

ভূ-স্বর্গে বিদ্রোহ
ইতিহাস ও প্রেক্ষিত

মুহাম্মদ ফারুকে আজম চৌধুরী

www.pathagar.com

ভূ-স্বর্গে বিদ্রোহ
ইতিহাস ও প্রেক্ষিত
মুহাম্মদ ফারুকে আজম চৌধুরী
প্রকাশক
জেবুন্নেছা সিদ্দীকা
প্রথম প্রকাশ
১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৯
স্বত্ব: লেখক
প্রচ্ছদ
মোহাম্মদ তোয়াহা
শব্দ বিন্যাস
মারুফুল আলম চৌধুরী
বিনিময়
একশত বিশ টাকা
পরিবেশক
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৮৪১৭৫৮ ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৩৯৫৪০
E-mail: asfaqur@bdonline.com

BHU-SARGE BIDROHA
ITIHAS O PREKKIT
MUHAMMAD FARUQE AZAM CHOWDHURY
PUBLISHER
ZEBUNNESA SIDDIQA
FIRST EDITION
16 SEP. 1999
COPY-RIGHT
AUTH0R
COVER
MOHAMMAD TOAHA
COMPOSE
MARUFUL ALAM CHOWDHURY
PRICE
120 TK. ONLY
DISTRIBUTOR
PREETI PROKASHON
435/KA BARA MOGHBAZAR, DHAKA-1217
PHONE: 841758 FAX: 880-2-839540
E-mail: asfaqur@bdonline.com

www.pathagar.com

উৎসর্গ

বাবা মরহুম জামাল আহমদ চৌধুরী
মা মরহুমা আয়েশা সিদ্দিকা
মামা নজমুল হক সিদ্দিকি
স্নেহাস্পদ সন্তান রাফাত ও মুন
এবং
শতাব্দির দেয়ালে দেয়ালে যাঁরা ইসলামি
রেনেসাঁর স্লোগান লিখে যাচ্ছেন

যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ

কবি আল মাহমুদ
নাজির আহমদ কাশ্মিরি. *WAMY. জেদ্দা*
শবনম কাইউম . *শ্রীনগর*
ড. আ.ন.ম মুনির আহমদ চৌধুরী
অধ্যক্ষ মাওলানা আবু তাহের
আলহাজ্ব হেলাল হুমায়ুন
ইকবাল করিম রিপন
মুরশিদুল আলম চৌধুরী
জিয়াউল হক শামীম

www.pathagar.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রবেশিকা

'ভূ-স্বর্গে বিদ্রোহ : ইতিহাস ও প্রেক্ষিত' শীর্ষক জনাব মুহাম্মদ ফারুকে আজম চৌধুরীর বইটি পড়ে কাশ্মিরের হাজার বছরের ইতিহাস ও এর জনগণের সংগ্রামমুখর জীবনের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় জানা গেল। বইটি এর আগে পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পাওয়ার সময়ও এর কিছু অংশ আমার পাঠ করার সুযোগ হয়েছিল। ফারুকে আজম চৌধুরী বেশ কিছুকাল যাবৎ সৌদি আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে বসবাস করা সত্ত্বেও উপমহাদেশের বর্তমান ঘটনাধারার ব্যাপারে বেশ ওয়াকিবহাল। ইতিহাসের প্রতি তাঁর আশ্চর্য অনুরাগ আমাকে অভিভূত করেছে। তিনি তাঁর বইয়ে কাশ্মিরের জনগণের ভাষা ও জাতীয় বৈশিষ্টগুলোর পরিচয় দিতে যেমন চেষ্টা করেছেন, তেমনি এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব, গোত্রীয় ও বংশীয় শাসন, স্বল্পকালীন মুসলিম শাসন ও ইসলামের ভিত্তিভূমি রচনার পটভূমি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ডোগরাদের ক্ষমতারোহন ও অত্যাচারের কাহিনী এতে যেমন আছে, তেমনি ইংরাজদের গোলাব সিংয়ের কাছে দেশ বিক্রির চমকপ্রদ ঘটনাও তিনি ব্যক্ত করেছেন। সবশেষে বিস্তারিতভাবে বিভাগ পরবর্তীকালে কাশ্মিরের অবস্থা এবং কাশ্মির নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধের নেপথ্য কাহিনীও লেখক বলেছেন। মোটকথা, কাশ্মিরের বর্তমান অবস্থা, মুসলমানদের ওপর জুলুম-নিপীড়নের কাহিনী বর্ণনা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিতও বইটিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র হলেও বইটি মূল্যবান। লেখকের গদ্যভঙ্গীও বিষয়বস্তুর উপযোগী বলে আমার ধারণা হয়েছে।

কাশ্মির এই উপমহাদেশের একটি জ্বলন্ত বিষয়। আমরা অনেক ঘটনারই সঠিক বিবরণ জানি না। কাশ্মির নিয়ে পাক-ভারত বিরোধের ব্যাপারেও লেখক কাউকে ছেড়ে কথা বলেননি বলেই হয়ত লেখকের এক ধরনের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ ঘটেছে। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনায় লেখকের আগ্রহ সার্থক ও সফল হোক– এই কামনা করি।

(আল মাহমুদ)
২৮.৮.'৯৯

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

১৯৯৫ সনের কথা। জেদ্দাস্থ বিশ্ব মুসলিম যুব সংস্থার অফিসে বসে কাশ্মিরে নারী নির্যাতনের ওপর প্রকাশিত একটি সচিত্র প্রতিবেদন পড়ছিলাম। এই প্রতিবেদনে দেখতে পেলাম, ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধির জন্মদিবস পালন করা হচ্ছিল গোটা ভারত জুড়ে। গান্ধিজির বিখ্যাত অহিংস আদর্শের বাস্তবায়ন ও অনুকরণের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হচ্ছিল সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন মানবতাবাদী অহিংস আদর্শের অনুসারী সংগঠন-সংস্থার উদ্যোগে। সেদিনই শ্রীনগর শহরের অনতিদূরে মুসলিম বসতি 'হিন্দুওড়া'কে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দিল ভারতীয় ফোর্স। নির্যাতিত মুসলিম নারীর লুণ্ঠিত সম্ভ্রমের ভয়াল আর্তচিৎকারে বিভৎস হল সে বসতি।

প্রকাশিত সে রিপোর্টে আরও দেখা যায়, ৩০ জানুয়ারি বাপুজি মহাত্মা গান্ধির হত্যাদিবস পালন করা হচ্ছিল যে মুহূর্তে, প্রার্থনা সভা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের মাধ্যমে, সে মুহূর্তের ভারতের সরকারি রিপোর্ট মতে, খানাতল্লাশির বাহানায় নয়জন কাশ্মিরি মুসলমানকে গুলি করে হত্যা ও ১৩ জনকে আহত করা হয়। বেসরকারি রিপোর্টে এ দিন ভারতের বাহাদুর (!) জওয়ানদের নারী নির্যাতন ও সম্ভ্রমহানির বিভৎসতা নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়।

মোগল সম্রাট শাহজাহান অপূর্ব সৌন্দর্যের লিলা-নিকেতন কাশ্মিরের অপ্রতিম রূপমালায় আকৃষ্ট হয়ে অভিভূত চিত্তে বলেছিলেন,
"আগর ফেরদাউস বর রোয়ে জমিন আস্ত
হামিঁ আস্ত, ওয়া হামিঁ আস্ত, ওয়া হামিঁ আস্ত
(মর্ত্যের কোথাও যদি স্বর্গ বিরাজ করে, তা এখানে, এখানে এবং এখানেই।)

সাতচল্লিশের ভারত বিভাগের সময় যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার লেলিহান শিখা গোটা উপমহাদেশ গ্রাস করছিল, তখন হিমালয়ান উপত্যকা কাশ্মিরই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম। যা দেখে মহাত্মা গান্ধি কাশ্মিরকে "(আশার) একমাত্র আলোর কিরণ" বলে আখ্যা দিয়েছিলেন।

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কাশ্মিরের সঙ্গে ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক সম্পৃক্ততার কারণে কাশ্মিরকে তাঁর দেশের 'শাহরগ' বলে ঘোষণা করেছিলেন।

কাশ্মিরের সবুজ প্রান্তরে আজ দাউ দাউ করে জ্বলছে বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। এখানকার সবুজ প্রান্তর আজ লাখো আদম সন্তানের রক্ত, অশ্রু ও করুণ আর্তনাদে ভারি। স্বাস্থ্যকর আলো-বাতাসে আজ বারুদ আর পোড়ামাটির গন্ধ। মোগল সম্রাটের "ভূ-স্বর্গ" আজ মর্ত্যের নরক। গান্ধিজির "আলোর কিরণ" আজ অমানিশার ঘোর অন্ধকারে অগ্নি ও খুনের ইবলিসি নৃত্যের 'প্রেতরাজ্য'। মি. জিন্নাহর 'শাহরগ' রক্ত, হত্যা ও মুসলিম ললনার লুণ্ঠিত সম্ভ্রমের আর্তচিৎকারের 'ভয়াল উপত্যকায়' পরিণত হয়েছে।

জাতিসংঘ সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দিকাল অবধি একটা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে নিছক পাক-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও সমস্যার নিগড়ে আবদ্ধ রেখেছে। এ কথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, পাক-ভারত দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের নিরিখে ঘোর তমশাচ্ছন্ন জটিল দুর্বিপাকে আটকা এ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান আদৌ সম্ভব নয়। দশকের পর দশক উপমহাদেশের লালিত শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নতি-সমৃদ্ধি আটকা পড়ে আছে সবুজ পর্বতমালার

www.pathagar.com

গিরিসঙ্কটে। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক ও সামরিক আবহাওয়া দারুণভাবে উত্তপ্ত ও গুমোট-বাঁধা। পাক-ভারত মানবতা-বিধ্বংসী আণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি। ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের প্রেক্ষাপটে কাশ্মির-ইস্যু আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পরিমণ্ডলকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করছে।

সীমাহীন এক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে মুসলিম-অধ্যুষিত এই জনপদ। শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতি পদক্ষেপ আরও দ্বিগুণ জটিলতার সৃষ্টি করছে। দুর্ভেদ্য এই সমস্যা সমাধানের দূরতম কোনও সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাই বিশ্বব্যাপি শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের দীপ্ত প্রত্যয়ে সূচিত একবিংশ শতাব্দির বিশ্ব-বিবেকের কাছে প্রশ্ন: নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়নে নতুন বিশ্বব্যবস্থার আলোকে ইরাকে বিশ্ব সম্প্রদায় যে ভূমিকা পালন করেছে অতিসম্প্রতি, সেই একই সংস্থার কাশ্মির নিয়ে একাধিকবার পাশকৃত প্রস্তাব বাস্তবায়নে বাধা কোথায়? বিশ্ব সম্প্রদায়কে আজ বিবেচনা করতে হবে, তারা কি নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব কার্যকর করে এ অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হবে, নাকি এই অঞ্চলের মানুষকে ভয়াবহ সংঘাতের দুর্বিষহ কালো মেঘের ছায়াতলে আবদ্ধ রাখবে। আর কাশ্মির উপত্যকার মিষ্টিপানির ঝর্ণায় প্রবাহিত হতে থাকবে অগ্নি-খুনের ঝর্ণাধারা! এমন কেন হচ্ছে? এর জন্য দায়ি কে বা কারা? এটা কি নিছক ব্রিটিশ বেনিয়াদের ষড়যন্ত্রের ফসল, নাকি নতুন বিশ্বব্যবস্থার মুসলিম স্বার্থ বিনাশ-নীতির বাস্তবায়ন? এটা কি বিচক্ষণ দুর্জনের দেয়া দুরারোগ্য ক্ষত, নাকি নির্বোধ স্বজনের নির্বুদ্ধিতা? কাশ্মির নিয়ে কে কার ইঙ্গিতে কী ভূমিকা পালন করেছে– এ সব আজ যুগ-জিজ্ঞাসা। কিছুটা তিক্ত হলেও দুর্বোধ নয় এর জবাব। ইতিহাসের এমন কিছু 'তিক্ত হলেও সত্য' ঘটনাপ্রবাহের অবতারণা ঘটেছে এ গ্রন্থে।

শতাব্দিকাল- বিস্তৃত জটিল রাজনৈতিক ও সামরিক গুরুত্ববহ কাশ্মির-ইস্যুর ওপর মসি চালনা সুকঠিন ব্যাপার। একটা প্রবন্ধ কিংবা বই লিখে এটা শেষ করার বিষয় নয়। সুদূরপ্রসারি এই ইস্যু উচ্চমানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের খণ্ড খণ্ড গবেষণাকর্মের ব্যাপকতর ক্ষেত্র। উপরন্তু এটা বিশ্ববিখ্যাত অনেক বিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতৃত্বের পদচারণার বিস্তীর্ণ ময়দান। এমন বিদগ্ধ ব্যক্তিবর্গের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর কলম ধরা আমার মত কাচা হাতের পক্ষে দুঃসাহসের ব্যাপার। বস্তুত, এটা আশৈশব লালিত মুসলিম স্বার্থ-চেতনার ঝোঁক প্রবণতার আকুতি ছাড়া আর কিছু নয়।

ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্র ও অহিংস মানবতাবাদী 'বাপুজি'র আদর্শ-অনুসারী দেশে তাঁরই 'জন্ম-মৃত্যুদিবস'-এ অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতনের স্ববিরোধী কর্মকাণ্ড আমাকে কাশ্মির বিষয়ে অধ্যয়নে আকৃষ্ট করে। বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ ছাড়া বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যবহুল গ্রন্থের অভাববোধই আমাকে আমার সীমিত অধ্যয়নের নির্যাসকে বই আকারে ছাপানোর তাগিদ দিয়েছে। বাংলা ভাষায় কাশ্মির ও কাশ্মির সমস্যার উৎসের সন্ধানে সতর্ক কদম রাখার প্রয়াস পেলাম। তথ্যভিত্তিক ও প্রামাণ্য আলোচনা পেশ করার চেষ্টা ছিল। সাফল্য-ব্যর্থতার বিচারের দায়িত্ব সুহৃদ পাঠক সমাজের।

মুহাম্মদ ফারুকে আজম চৌধুরী

১৭ জুন, ১৯৯৯. মক্কা

www.pathagar.com

সূচিপত্র

ভৌগলিক অবস্থান	৯
নামকরণ, ভূ-প্রকৃতি, অধিবাসী ও ভাষা	১০
কাশ্মিরে বিভিন্ন গোত্রীয় ও বংশীয় শাসন	১১
কাশ্মিরে ইসলাম ধর্মের আগমন ও প্রথম মুসলিম শাসক	১৩
কাশ্মিরে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সংগঠিত প্রয়াস	১৫
মুসলিম শাসনের বিপর্যয়ের সূচনা	১৭
কাশ্মিরে মোগল শাসন	১৯
আওরঙ্গজেবের কাশ্মির শাসন	২১
কাশ্মির উপত্যকায় আফগান শাসন	২২
কাশ্মির রাজ্যে শিখ শাসন : দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত	২২
কাশ্মিরে ডোগরা শাসন : কেনা-বেচার সূচনা	২৪
দেশ বিক্রির অনুশোচনা : ডোগরা শাসকের ক্ষমতা প্রত্যাহার ও পুনর্বহাল	২৬
বিদ্রোহের সূচনা : আত্মপরিচয়ের দিক নির্দেশনা	২৭
রাজ্যের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের মর্মান্তিক পরিণতি	৩০
মুসলিম কনফারেন্সের পুনরুজ্জীবন ও পাকিস্তান প্রস্তাব	৩৪
পাকিস্তানভুক্তির প্রস্তাব	৩৫
আন্তর্জাতিক আইন ও অমানবিক সংযুক্তি চুক্তি	৩৭
বিশ্ব জনমতের কাছে ভারতের প্রতিশ্রুতি	৪০
জিন্নাহ'র নির্দেশ পালনে ইংরেজ সেনাপ্রধানের অসম্মতি	৪৪
জাতিসংঘ ও কাশ্মির	৪৫
'৪৭-এর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ: একটি পর্যালোচনা	৪৯
লেয়াকত-ইব্রাহিম আলোচনায় নেপথ্যের ঘটনা	৫১
যদি এমন হত: কর্নেল আব্বাসির ভিন্নমত	৫২
সূক্ষ্ম কূটকৌশলে ভারত অগ্রগামি	৫৩
কাশ্মির ইস্যু: টার্গেট রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ	৫৪
জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের ভারতভুক্তি একটি নির্জলা মিথ্যা নাটক	৫৫
১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬: শান্তির পথে সুদীর্ঘ পথযাত্রা	৫৮
কাশ্মির সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান-প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্যায়	৬২
'৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ: নেপথ্যের জিব্রালটার কাহিনী	৬৪
শান্তিপূর্ণ সমাধান-প্রচেষ্টার তৃতীয় পর্যায়	৬৮
দিল্লির ক্রীড়নক শেখ পরিবারের সর্বশেষ উত্তরাধিকার ফারুক আব্দুল্লাহ	৭০
চলমান আন্দোলনের পটভূমি	৭৩
হযরতবাল: প্রেরণার আরেক উৎস	৮১
কাশ্মির সমস্যার প্রকৃত সমাধান কোন পথে	৮৩
সম্ভাব্য সমাধান: বিকল্প প্রস্তাবনা	৮৬
সমাধান	৯৫
কারগিল: পরাজিত যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে	৯৭
তথ্যপঞ্জি	১০১

www.pathagar.com

ভৌগলিক অবস্থান

চুরাশি হাজার বর্গমাইল বিস্তৃত কাশ্মির উপত্যকার বর্তমান জনসংখ্যা এক কোটি। কোন কোন বর্ণনা মতে, এর লোকসংখ্যা এক কোটি বিশ হাজার। জম্মু, কাশ্মির ও উত্তর এলাকাসমূহ নিয়ে গঠিত এই উপত্যকা সমগ্র এশিয়ায় ভূ-রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূখণ্ডটি সমুদ্রসীমা থেকে দুই হাজার হতে ছয় হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এবং অধিকাংশ পাহাড়ি ভূমির সীমান্ত রেখা ভারত, পাকিস্তান, চিন ও রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত। পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে রাভি নদি ও ঝিলাম নদি। ঝিলাম নদি কাশ্মিরের প্রাণধারা, রক্তস্রোত। এ নদীর জলের বিম্বিত ঝিকিমিকি আলোকছটা আর ভাসমান বাগিচা জগদ্বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "সন্ধ্যার রাগে ঝিলিমিলি ঝিলামের স্রোতখানি বাঁকা আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ার....।" জম্মু এর শীতকালীন রাজধানী। সমুদ্র-সমতল থেকে যার উচ্চতা একহাজার তেইশ ফুট। সারা বছরই গ্রীষ্ম আবহাওয়া বিরাজ করে এখানে। এখানে কয়লা, এলুমিনিয়াম, তামা ও মূল্যবান নীলকান্তমনি ইত্যাদির খনিও রয়েছে।

কাশ্মির: যার দৈর্ঘ্য চুরাশি মাইল ও প্রস্থ পঁচিশ থেকে আটাশ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র-সমতল থেকে ছয় হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এবং উত্তর-পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের সুউচ্চ পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীর মত; আর দক্ষিণ ভাগের প্রস্তর, কঙ্কর-ভূমি এই উপত্যকার ভৌগলিক স্বাতন্ত্রের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে। কাশ্মির মনোরম ঝিল, হ্রদ, ঝর্ণাধারা, জলপ্রপাত, সমুদ্র-মেখলা পাহাড়ঘেরা বাগ-বাগিচায় পূর্ণ এক রমণীয় রাজ্য। এখানকার সুবাস-ছড়ানো পুষ্পোদ্যান আর মিষ্ট-পানির ঝিল ও স্বাস্থ্যকর স্থানসমূহ সারা দুনিয়ার পর্যটকদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে।

ঝিলাম নদির দুই প্রান্তের জনবহুল শহর শ্রীনগর এই রাজ্যের রাজধানী। রাজা অশোক কর্তৃক স্থাপিত ঐতিহাসিক শ্রীনগর শহর উপমহাদেশের বহু পুরাতন ও প্রসিদ্ধ শহর। শ্রীনগর বছরের অর্ধেক সময় থাকে তুষারাচ্ছাদিত। এ সময় জনগণ থাকে নিজ ঘরে বন্দি। তখন কাংড়ি তাপের উষ্ণতা আর জানলা দিয়ে তুষারপাত দেখা ছাড়া অন্য কোন কাজ থাকে না। বছরের বাকি অংশ থাকে পূর্ণ যৌবনোচ্ছল।

জম্মু ও কাশ্মির উপত্যকার এক তৃতীয়াংশ হল লুদাখ। পাহাড়ি এলাকার এই অংশ কাশ্মিরের উত্তর দিকে অবস্থিত। সমুদ্র-সমতল থেকে প্রায় আট হাজার থেকে পনের হাজার ফুট উঁচুতে তার অবস্থান। হিম প্রবাহের কারণে শীতকালে রাজধানী শ্রীনগর শহরের সঙ্গে এর যোগাযোগ মাসাধিককাল বিচ্ছিন্ন থাকে।

আজাদ কাশ্মির: জম্মুর পাঁচ হাজার বর্গমাইল ও কাশ্মিরের আটাশ হাজার বর্গমাইল এলাকাসমেত গিলগিত ও বলতিস্তানের একটা অংশ নিয়ে গঠিত আজাদ কাশ্মির। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে এই এলাকা আজাদ কাশ্মির নামে খ্যাত। এটি বর্তমানে পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত। মুজাফফরাবাদ এই রাজ্যের রাজধানী।
বর্তমানে ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মির রাজ্য ছয় লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্যের নিয়ন্ত্রণে হিন্দুস্থানের শাসনাধীন।

www.pathagar.com

নামকরণ, ভূ-প্রকৃতি, অধিবাসী ও ভাষা

এই উপত্যকার ভূমি ও জনবসতি সম্পর্কে ইতিহাসবিদগণ ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। নিত্য-নতুন গবেষণা ও ইতিহাস বিশ্লেষণে যে সব তথ্য উদঘাটন হচ্ছে, এতে বলা যায়, এই সব মতামতের কোনও একটিকে নির্ভুল ও চূড়ান্ত বলে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না।

একটি মতে, এই উপত্যকার পুরো এলাকাটাই ছিল চতুর্দিক থেকেই পাহাড়ঘেরা হ্রদ। এই হ্রদের পশ্চিম দিকে ছিল কঙ্করময় জলস্রোত। শত শত বছরের প্রাকৃতিক ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এই হ্রদের পানি শুকিয়ে যায়। হিম-প্রবাহের কারণে এখানে স্থায়ী জনবসতি স্থাপন সম্ভব হত না। শুধুমাত্র দক্ষিণের যাযাবর শ্রেণীর লোকেরা গ্রীষ্মকালের কিছু সময় এখানে অবস্থান করত। অতপর প্রকৃতির কৃপায় ধীরে ধীরে তাপমাত্রায় পরিবর্তন আসে। অবশেষে খ্রিস্ট-জন্মের দু'হাজার বছর পূর্বে এই উপত্যকা কৃষি-কার্য ও জনবসতি স্থাপনের উপযোগী হয়ে ওঠে। এই মতের ঐতিহাসিকের ধারণা হল, উপত্যকার আদি ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থার নিরিখেই তার নামকরণ হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দ 'কা' অর্থ পানি আর 'শ্মির' অর্থ সেই ভূমি, যার পানি নিষ্কাশিত হয়েছে; এভাবেই কাশ্মির নামকরণ হয়েছে। অপর একটি মতে, এর আসল নাম ছিল 'কাশির'। 'কাশ' নামক একটি গোত্র এই এলাকা আবাদ করেছে। গোত্রটির আদি-নিবাস ছিল 'কাশগড়' ও 'কাশন'। 'কাশের' সাথে 'আন' যোগ হয়ে যেমন 'কাশন' ও 'গড়' যোগ হয়ে 'কাশগড়' হয়, তেমনি 'কাশ' এর সাথে 'মির' যোগ হয়ে 'কাশ্মির' নাম ধারণ করে। মোগল সম্রাট বাবর–যিনি ১৫৫৬ সালে ভারত জয় করেন–বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে 'কাশ' বা 'কাস' নামক লোকের সঙ্গে সংযোগ রেখেই কাশ্মির নামকরণ হয়েছে। অপর এক মতে, এই উপত্যকার আদিবাসী ছিল 'নাগ' জাতি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত 'উরিয়া' সম্প্রদায়ের প্রবল স্রোতের প্রতাপে 'নাগ' জাতিও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিক ফ্রান্সিস এর মতে, এখানকার গ্রামীণ অধিবাসীদের রং, ভাষা ও আচার-আচরণের সঙ্গে ইস্রাইলিদের সামঞ্জস্য স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। তিনি বলেন, এখানকার পুরুষ-শ্রেণী দেখতে অবিকল ইস্রাইলিদের মত। বের্নিয়রের (Bernier) মতে, পীরপঞ্জাল এলাকা হয়ে কোনও লোক যখন উপত্যকায় প্রবেশ করে, তখন এখানকার গ্রামীণ পরিবেশ ইস্রাইলের মতই মনে হয়। আলবেরুনির মতে, এখানকার আদিবাসীরা বহিরাগতদের উপত্যকায় প্রবেশের ক্ষেত্রে কড়া বিধি-নিষেধ আরোপ করত। শুধু ইহুদি সম্প্রদায়ের লোকদেরই বিনা নিরীক্ষায় প্রবেশের অনুমতি ছিল।

ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন মতামতের আলোকে ঐতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কাশ্মির উপত্যকার অধিবাসীরা মূলত ইহুদি ও উরিয়া সম্প্রদায়ের মিশ্রিত বংশের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত আছে। ডোগরি, লুদাখি, পাঞ্জাবি, গোজরি ও কাশ্মিরি ইত্যাদি আঞ্চলিক ভাষা চালু থাকলেও বর্তমান সরকারি ভাষা হিসাবে উর্দুই স্বীকৃত এবং দৈনন্দিন জীবনে উর্দুর প্রভাবই ব্যাপক। অধিবাসীর শতকরা পঁচাশি ভাগ মুসলিম। হিন্দু-সম্প্রদায় এখানকার দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু শ্রেণী। তৃতীয় সংখ্যাগুরু শ্রেণী হল শিখ সম্প্রদায়।

www.pathagar.com

কাশ্মিরে বিভিন্ন গোত্রীয় ও বংশীয় শাসন

আদিকালের কাশ্মির ছিল বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশের শাসক ছিলেন আলাদা আলাদা। হিন্দু ব্রাহ্মণরাই দীর্ঘকাল এই বিভক্ত উপত্যকা শাসন করেছে। একটানা দীর্ঘকাল শাসন পরিচালনার পর শাসকশ্রেণীর মধ্যে অনৈক্য ও অন্তঃবিরোধ সৃষ্টি হলে এক অংশ জম্মুর রাজপুত রাজাকে কাশ্মিরে হস্তক্ষেপের আমন্ত্রণ জানায়। দয়া কিরণ নামের এই রাজপুতকেই কাশ্মিরের প্রথম 'বিধানসম্মত' রাজা বলে ধরে নেয়া হয়। তিনি ছিলেন সুরজ বন্সি খান্দানের লোক। এই বংশের পঞ্চান্ন জন রাজা একের পর এক কাশ্মির রাজ্য শাসন করেন।

কুলহনের মতে, সুরজ বন্সির পর কাশ্মির রাজ্যে পাণ্ডু খান্দানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পাণ্ডু বংশের পঁয়ত্রিশ জন শাসক একের পর এক প্রায় এক হাজার বছর কাশ্মির শাসন করেছেন।

পাণ্ডু রাজ-বংশের পর মুরিয়া বংশ কাশ্মির শাসনের অধিকারী হয়। ইতিহাস-খ্যাত অশোক ছিলেন এই বংশেরই সন্তান। খ্রিস্টপূর্ব ২৩১ থেকে ২৭২ পর্যন্ত তিনি শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অশোকই প্রাচীনতম শহর শ্রীনগরের গোড়াপত্তন করেন।

মুরিয়া বংশের পতনের পর কুশন রাজবংশ কাশ্মির শাসন করে। প্রখ্যাত রাজা কুনশক এই বংশেরই লোক ছিলেন। পেশোয়ার ছিল তাঁর রাজধানী। তিনিও বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তাঁর শাসনামলে একশত খ্রীস্টাব্দে কাশ্মিরেই তৃতীয় বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

কুশ পরিবারের শাসনকালের পর গুপ্তদ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের শাসকগণ হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনের জন্য সুসংগঠিত প্রচেষ্টা চালান। বলা যায়, এই সময়ই বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। বৌদ্ধ ধর্মের হাজারও উপাসনালয় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভস্ম করে দেওয়া হয়। ফলে এই ধর্ম ধীরে ধীরে সংকুচিত হতে থাকে।

৫২৮ খ্রিস্টাব্দে হুন (মঙ্গোল) বংশের মেহরাগুল নামক কুখ্যাত ব্যক্তি কাশ্মিরের তদানিন্তন শাসককে হত্যা করে শাসন-ক্ষমতা দখল করেন। কথিত আছে যে, এই অত্যাচারী শাসক হাজারও মহিলাকে হত্যা করেছেন। এই শাসক ব্রাহ্মণশ্রেণীকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করতেন এবং বৌদ্ধ ধর্মকে কঠোরভাবে ঘৃণার চোখে দেখতেন। এই বংশেরও একদিন পতন আসলে রাজা হরিষ কিছুদিনের জন্য কাশ্মিরের শাসন-ক্ষমতা দখল করে নেন। অতঃপর ৫৮০ সালে মালব্যের রাজপুত্র পরওয়ার সেন কাশ্মির জয় করেন। কোনও কোনও ঐতিহাসিকের মতে, তিনিই শ্রীনগর শহরের গোড়াপত্তন করেন।

হুন বংশের পতনের পর ৬২৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৯৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত করকুটা খান্দানের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়। ললিতা দত্ত এই বংশেরই একজন প্রসিদ্ধ শাসক ছিলেন। এই সময় কাশ্মির রাজ্যের উন্নয়ন, জনকল্যাণ ও প্রতিবেশী দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক

www.pathagar.com

স্থাপিত হয়।

৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮৮৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উনতি বর্মন নামক একজন দক্ষ শাসক উপত্যকার শাসনকার্য পরিচালনা করেন। অভিজ্ঞ কৃষি বিজ্ঞানীদের সহায়তায় তিনি কাশ্মির রাজ্যের ভূমি চাষাবাদযোগ্য করে তোলেন। ৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট আঠার জন শাসক এখানে রাজত্ব করেন।

৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথম লোহরা রাজ-বংশের বিদ্যারানী কাশ্মিরে রাজত্ব করেন। এই বংশের রাজত্বকালেই মাহমুদ গজনবি ১০১৫ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মির রাজ্য আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে রাজ্য-সৈন্যের পতন ঘটলেও বরফাচ্ছাদিত পার্বত্যাঞ্চলের প্রচণ্ড হিমপ্রবাহের কারণে মাহমুদ গজনবি প্রত্যাবর্তন করেন। ১১১১ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১১২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় লোহরা বংশের অকুলা ও সগুলা নামক দু'ভাই রাজ্য পরিচালনা করেন। এই লোহরা বংশেরও পতনের পর এই রাজ্যের জনগণ প্রায় দেড়শত বছর পর্যন্ত আরও ছয়জন রাজার শাসনকাল প্রত্যক্ষ করে। এই দীর্ঘ সময়ের শাসনকালে রাজ্য ছিল সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল, লুণ্ঠন ও খুনাখুনিতে পূর্ণ। এমনকি রাজা সুহাদেবের (১৩০৫) রাজত্বকালে কাশ্মির ছিল অসামাজিক আচার-আচরণ ও অনৈতিক কার্যকলাপে পরিপূর্ণ। এই সময় একজন তাতারি বাদশাহ কাশ্মির আক্রমণ করে অগাধ ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যান। কথিত আছে যে, লুণ্ঠিত সম্পদ নিয়ে ফিরে যাওয়ার পথে পর্বতমালায় হিমপ্রবাহের কারণে তাতার বাদশাহ তাঁর সাঙ্গপাঙ্গসহ মৃত্যুবরণ করেন। এদিকে তাতার বাদশাহর আক্রমণে ভীত-সন্ত্রস্ত সুহাদেব রাজ্য ছেড়ে কিশ্তুয়াড়ার দিকে পলায়ন করেন। এই সুযোগে শূন্য সিংহাসন দখল করার জন্য কিশতুয়াড়ার শাসক কাশ্মিরে প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনা করেন। সুহাদেব দেশ ছেড়ে পালালেও তাঁর সেনাপ্রধান রামচন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। এই প্রতিরোধ-যুদ্ধে শাহমীর ও রঞ্চন নামক দুই সরদারও রামচন্দ্রের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শাহমীর ছিলেন সোয়াতের অধিবাসী। আর রঞ্চন শাহ ছিলেন লুদাখের রাজপুত্র। বিজয় লাভের পর রঞ্চন শাহ রামচন্দ্রকে হত্যা করে তার কন্যা কুটারানীকে বিয়ে করে ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। অতঃপর অপর সহযোগী শাহমীরকে তাঁর মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কুটারানীর ভাই বারন কিন্দ্রাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

কাশ্মিরে ইসলাম ধর্মের আগমন ও প্রথম মুসলিম শাসক

কাশ্মির উপত্যকায় ইসলামের চর্চা আরবে হযরত মুহাম্মদ (স.) -এর আগমনের পর থেকেই শুরু হয়। নবী (স.) যেসব রাজা বাদশাহর কাছে ইসলামের দাওয়াত-পত্র-প্রদান করেন, তার মধ্যে কাশ্মিরের রাজাও শামিল ছিলেন। মুসলমানদের কাশ্মিরে আগমন ও এখানকার অধিবাসিদের সঙ্গে মেলামেশা মূলত কাশ্মির রাজা ললিতা দত্তের শাসনামলেই শুরু হয়। সচেতন এই রাজা আরবদের উদীয়মান শক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করতেন। বলা যায়, রাজ্যের নিরাপত্তার দিক চিন্তা করেই তিনি আরবদের সঙ্গে যোগাযোগ ও সুসম্পর্ক রাখতে আগ্রহী ছিলেন। এদিকে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ বিন কাসিম রাজা দাহিরকে পরাজিত করে সিন্ধু জয় করলে দাহিরের পুত্র পলায়ন করে কাশ্মিরের রাজার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর সঙ্গে একজন সিরীয় মুসলমানও ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে কাশ্মিরে ইসলাম ধর্মের প্রচার-কার্যে নিয়োজিত হন। বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় যদিও মুলতান পর্যন্তই বিস্তৃত ছিল, তথাপি এই বিজয়ের ফলে মুসলিম ব্যবসায়িরা কাশ্মির পর্যন্ত গমনাগমন করে ইসলামের আদর্শ প্রচার করতে থাকেন। এর পর কাশ্মির উপত্যকার মুসলিম ইতিহাস মাহমুদ গজনবি থেকেই শুরু হয়। তিনি সর্বমোট সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন। ১০২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি কাশ্মির পর্যন্ত পৌঁছে সেখানে মাসাধিক কাল অবস্থান করেন। এই স্বল্প সময়ে মুসলিম সৈনিকদের অবস্থানকালেও স্থানীয় জনগণের সঙ্গে ইসলাম ধর্ম ও তার আচার-আচরণ তথা মুসলিম সংস্কৃতির পরিচিতি ঘটে। ত্রয়োদশ শতাব্দির শেষ দিকে মধ্য-এশিয়া ও কাশ্মির উপত্যকায় মুসলিম ব্যবসায়িশ্রেণীর আনাগোনার সূচনা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দির একজন প্রসিদ্ধ পর্যটক মার্কো বলেন, "এই সময় শ্রীনগর শহরে মুসলমানদের স্বতন্ত্র কলোনি প্রতিষ্ঠিত হয়"।

উপমহাদেশের মুসলিম ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, এখানে বিভিন্ন মুসলিম বিজয়ী শাসক ও তাঁদের সৈন্যবাহিনী এবং আরব বণিকদের প্রভাবে ইসলাম প্রচার ও পরিচিতি লাভ করে। এবং তাঁদের আচার-আচরণে আকৃষ্ট হয়ে স্থানীয় অধিবাসিরা ইসলাম ধর্মে প্রভাবিত হলেও সাধারণ মানুষের অন্তরাত্মায় ইসলামি আদর্শ সেই সব পুণ্যাত্মা প্রচারকদের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যাদের চাল-চরিত্র ছিল পূর্ণ ইসলামি আদর্শের বাস্তব উদাহরণ। এখানকার সাধারণ জনগোষ্ঠি প্রচারকদের কথার চাইতেও পূর্ণ ইসলামি চরিত্র -মাধুর্যের প্রভাবেই ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে বেশি। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে এই সমস্ত দ্বীন প্রচারকের আবির্ভাব ঘটেছে এই হিমালয়ান উপমহাদেশে। কাশ্মির উপত্যকায়ও এইসব সুমহান ব্যক্তিদের অক্লান্ত পরিশ্রমে, তাঁদের কথায়, কাজে, কর্মে আকৃষ্ট হয়ে লাখো লাখো মূর্তিপূজক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন।

ইতিহাসবিদরা এই ব্যাপারে পূর্ণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যে-সব মহান ব্যক্তিদের দাওয়াতে কাশ্মিরি অধিবাসিরা ইসলামের রৌশনি লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে সাইয়্যেদ

www.pathagar.com

শরফুদ্দিন আব্দুর রহমান প্রকাশ বুলবুল শাহ (রা.) অন্যতম। তুর্কিস্তানের অধিবাসী এই বুজর্গ কাশ্মিরের অলি-গলি-রাজপথ সফর করেন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে। তাঁর দাওয়াতেই কাশ্মিরের তদানিন্তন বাদশাহ রঞ্চন শাহ (র.) ইসলামে দীক্ষিত হন এবং সদরুদ্দিন নামধারণ করেন। এই সদরুদ্দিনই কাশ্মির রাজ্যের প্রথম মুসলিম শাসক হন। এর ফলে গোটা রাজ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করে। ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রচার-কার্যে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার ফলে রাজ্যের চতুর্দিকে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করতে থাকে। সমসাময়িক একজন রাষ্ট্রপ্রধানের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া কোনও মামুলি ব্যাপার ছিল না। বাদশাহর দেখাদেখি রাজ্যের সেনাবাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি, প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ও বাদশাহর আত্মীয়-স্বজন একযোগে ইসলাম গ্রহণ করেন।

কথিত আছে যে, বাদশাহ প্রথমত কোন ধর্মেরই অনুসারী ছিলেন না। রাজ্যে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্মের প্রতি বাদশাহকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তাঁর অস্থির চিত্ত এই সব ধর্মে কোনও স্বস্তি ও শান্তি খুঁজে পাচ্ছিল না। এক পর্যায়ে তিনি ঘোষণা করেন যে, কাল সকালে যে ব্যক্তির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত হবে তার ধর্মই গ্রহণ করব। অবশেষে সেই সুপ্রভাত উদিত হয় হেদায়েতের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা নিয়ে। শয্যা ত্যাগ করেই তিনি জানালা খুলে দেখতে পান, রাজপ্রাসাদের পাশে একজন স্বর্গীয় পুরুষ নামাজে মগ্ন। বাদশাহ ইতোপূর্বে এই ধরনের নামাজ আদায় করার মত ধর্মীয় অনুষ্ঠান আর কখনও দেখেননি। নামাজ শেষে সেই স্বর্গীয় পুরুষকে রাজপ্রাসাদে ডেকে আনা হল। হযরত বুলবুল শাহ (র.) তখনই বাদশাহর কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলে বাদশাহ সঙ্গে সঙ্গেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রশান্তি লাভ করেন।

১৩২৩ খ্রিস্টাব্দে সদরুদ্দিনের তিরোধানের পর সুহাদেবের কনিষ্ঠ ভাই কাশ্মির রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা দখল করে সদরুদ্দিনের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করেন। ইতোমধ্যে একজন তুর্কি সরদার রাজ্য আক্রমণ করলে কাশ্মির রাজা পলায়ন করেন।

রাজা পলায়ন করলেও মন্ত্রী শাহমীর দৃঢ়তার সঙ্গে আক্রমণ প্রতিহত করেন। এবং অচীরেই সুলতান শামসুদ্দিন নামধারণ করে কাশ্মির রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ক্রমাগত দুইশত বছর এই বংশের হাতেই রাজ্যের শাসন-ক্ষমতা বহাল থাকে। এই বংশের শাসনকালে কিছু ব্যতিক্রমী কার্যকলাপ ছাড়া ইসলামি সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

শাহমীর ওরফে সুলতান শামসুদ্দিনের ইন্তেকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র কুতুবুদ্দিন ক্ষমতাসীন হলেও অল্প দিনে দ্বিতীয় পুত্রের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন। সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র আলী শের শাসন-ক্ষমতা দখল করে সুলতান আলাউদ্দিন উপাধি ধারণ করেন এবং ১৩৪৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। আলাউদ্দিনের শাসনামলে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে রাজ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। আলাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শাহাবুদ্দিন রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সুলতান শাহাবুদ্দিন জনহিতকর কাজের জন্য কাশ্মিরের ইতিহাসে যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষায় তিনি সদা সতর্ক থাকতেন।

www.pathagar.com

কাশ্মিরে ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রথম সংগঠিত প্রয়াস

হযরত বুলবুল শাহ (র.)-এর মৃত্যুর পর কাশ্মিরে ইসলামের সঠিক শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে যে সকল অলি-বুজর্গ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত সাইয়েদ আলী হামদানি অন্যতম। কাশ্মির রাজ্যে ইসলামের দাওয়াত, প্রচার ও প্রসার কার্যে নিঃসন্দেহে হযরত হামদানি (র.) তাঁর সমকালীন আলেমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। তিনি দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যেই কাশ্মির আগমন করেন এবং সুসংগঠিত হয়েই এই কাজে ব্রতি হন। ইরানের প্রসিদ্ধ শহর হামদান থেকে তিনি একদল প্রচারক (মুবাল্লেগ) সঙ্গে নিয়েই কাশ্মির গমন করেন এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি বিপ্লব সাধনের ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে দৃঢ়ভাবে অবতীর্ণ হন। কাশ্মিরের সমাজব্যবস্থা, যাতে ছিল হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রধান্য, সেখানকার সমাজ-জীবনের সর্বক্ষেত্রে তিনি ইসলামি আদর্শ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলিম সমাজের সংস্কার ছাড়াও তিনি প্রায় সায়ত্রিশ হাজার অমুসলিমকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসেন। শ্রীনগর শহরে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত কালিস্বরি মন্দির, যার পুরোহিতরা ছিল সমাজে জুলুম অত্যাচারে মগ্ন, হযরত হামদানি (র.)-এর প্রচেষ্টায় মন্দিরের পুরোহিতসহ সকল পুজারিই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

যেহেতু কাশ্মিরে একটা পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল মূল লক্ষ্য, তাই তিনি সাধারণ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শাসকশ্রেণীর সংশোধনের দিকেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তদানিন্তন কাশ্মির শাসক সুলতান কুতুবুদ্দিনকে তিনি এই কাজে প্রভাবিত করেন, যাতে ইসলামি কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়। তিনি তাঁর দাওয়াত মসজিদ, খানেকা থেকে শুরু করে শাসন-ক্ষমতার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। সর্বোপরি ধর্ম ও রাজনীতির বিভক্তি দূর করতেও তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি পূর্ণমাত্রায় অবহিত ছিলেন যে, জনগণের মধ্যে ইসলামি আদর্শের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ছাড়াও শাসকশ্রেণীর সংশোধন ছাড়া ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মৌখিক দাওয়াত ও বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ইসলামি শাসন ব্যবস্থার ওপর তিনি "জখিরাতুল মুলুক" নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থও রচনা করেন। বইটি পড়লে বোঝা যায়, হযরত হামদানি (র.)-এর চিন্তা-চেতনায় একটা পরিপূর্ণ ইসলামি সমাজ-ব্যবস্থার পূর্ণ নকশা বিদ্যমান ছিল। ইসলামি

www.pathagar.com

সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার মত একদল নিষ্ঠাবান কর্মিবাহিনীও তিনি সৃষ্টি করেন। প্রায় সাত শতাধিক মুবাল্লিগের একটা দলকে তিনি কাশ্মিরের বিভিন্ন এলাকায় নিয়োজিত করেন, যারা দিন-রাত ইসলামি আন্দোলনের কাজেই ব্যস্ত থাকতেন।

সুলতান কুতুবুদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুলতান সিকান্দার উপাধি ধারণ করে রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৩৮৯ থেকে ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন-কার্য পরিচালনা করেন। একজন দ্বীনদার শাসক হিসাবে তিনি রাজ্যের সকল প্রকার ইসলামবিরোধী রসম-রেওয়াজ ও কার্যকলাপ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। হিন্দু সমাজে প্রচলিত কুখ্যাত সতীদাহ প্রথাও তাঁরই শাসনামলে রহিত করা হয়। বিজ্ঞ কাজী নিয়োগের মাধ্যমে রাজ্যে ইসলামি আদালত প্রতিষ্ঠা করে তিনি জনগণের ন্যায় বিচার পাবার পথ সুগম করেন। বিভিন্ন এলাকায় মসজিদ নির্মাণ করে মসজিদের সঙ্গে ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন। শ্রীনগর শহরের বিখ্যাত জামে মসজিদ তাঁরই শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত সাইয়েদ আলী হামদানির পুত্র মীর মোহাম্মদ হামদানি যখন দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনশত (কোনও কোনও বর্ণনা মতে সাত শত) শিষ্য নিয়ে কাশ্মিরে আগমন করেন, তখন সুলতান সেকান্দারও সেই দলভুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি শাসন- ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে উপত্যকায় ইসলাম প্রচারে সর্বপ্রকার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। কোনও কোনও অনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক সুলতান সেকান্দার সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, তিনি পূর্ণোদ্যমে রাজ্যের মন্দির ধ্বংস করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ অসত্য ও ভিত্তিহীন। আসল ব্যাপার ছিল এই যে, তাঁর রাজ-প্রশাসনে কিছু সংখ্যক নওমুসলিমও বিভিন্ন সরকারি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইসলামি সহিষ্ণুতা, উদারতা ও নিয়ম-নীতি সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তাঁদের কেউ কেউ কোনও কোনও মন্দিরের ক্ষতিসাধন করেন। এই কথা বাদশাহ অবহিত হলে সঙ্গে সঙ্গেই তা কঠোরভাবে দমন করা হয়। ২২ মোহররম ৮২০ হিজরি মোতাবেক ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সেকান্দর ইন্তেকাল করেন।

www.pathagar.com

মুসলিম শাসনের বিপর্যয়ের সূচনা

সুলতান সেকান্দার মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র মীর খান রাজ-ক্ষমতায় আরোহণ করেন এবং অচিরেই তাঁর কনিষ্ঠ ভাই শাহি খানের হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন। শাহি খান ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে রাজ সিংহাসন দখল করে জয়নুল আবেদিন উপাধি ধারণ করেন এবং ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বুড়শাহ নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। সুলতান জয়নুল আবেদিন একজন ভাল সংগঠক ও বিজ্ঞ শাসক হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি রাজ্যে সুষ্ঠু প্রশাসন পরিচালনা, বিচার বিভাগের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, শিক্ষা বিস্তার, শিল্প স্থাপন, দারিদ্র বিমোচন ও উন্নত সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত যোগ্যতার পরিচয় দেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন মিতব্যয়ী ও সহজ-সরল শাসক ছিলেন। ব্যক্তিজীবনে সাদাসিধে থাকলেও তাঁর পিতা সুলতান সিকান্দারের মত ইসলামি আদর্শের পৃষ্ঠপোষণ তাঁর শাসনামলে বাধাগ্রস্ত হয়। হযরত মীর মোহাম্মদ হামদানি (র.)-এর সহযোগিতায় সুলতান সেকান্দার ইসলামের যে বিপ্লবী চেতনার বিকাশ ঘটান, জয়নুল আবেদিনের শাসনকালে তা স্তিমিত হয়ে যায়। সিকান্দার শাহের আমলে প্রতিষ্ঠিত ইসলামি আইনের পরিবর্তে তিনি রাজ্য পরিচালনায় সাধারণ আইন (Common Code) কার্যকর করেন। ধর্ম ও রাজনীতি বিভক্তির যে চিন্তা-চেতনা পিতার শাসনকালে বিদূরিত হয়, তাঁর শাসনকালে তা আবার পুনর্জন্ম লাভ করে।

ইসলামের সংগ্রামী রূপ পুনরায় অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মের রূপ লাভ করতে থাকে। ফলে শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মধ্যেও ইসলামের বিপ্লবী চেতনার গতিহ্রাস পেতে থাকে। কেননা জনগণ শাসকশ্রেণীরই অনুসারী হয়ে থাকে। ইসলাম ও কাশ্মিরি মুসলিম জনগোষ্ঠির জন্য সুলতান সেকান্দার যতখানি আশীর্বাদ ছিলেন, জয়নুল আবেদিনের শাসনকাল ততখানি কল্যাণকর ও আশীর্বাদপুষ্ট ছিল না। পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করার পর ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইন্তেকাল করেন।

জয়নুল আবেদিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র হায়দার শাহ নামধারণ করে কাশ্মির রাজ্যের শাসনভারগ্রহণ করেন। তাঁর পুরো শাসনকালটাই ছিল পারিবারিক কোন্দলে পরিপূর্ণ। মাত্র দু'বছর শাসনকার্য পরিচালনার পর ১৪৭২ খ্রিস্টাব্দে একদিন নেশাবস্থায় দালানের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ পারিবারিক দ্বন্দ্ব-কোন্দলে

www.pathagar.com

মত্ত থাকার পর হাসান শাহ ক্ষমতাসীন হন। অভ্যন্তরীণ বিবাদ-কোন্দল ও শাসনকার্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে থেকেও শাহমীর বংশ দীর্ঘকাল যাবৎ রাজ্য শাসন করতে থাকে। মূলত এই সময় ছিল শাহমীর বংশের পতনের কাল। অবশেষে ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে চক বংশের হাতে শাহমীর বংশের পতন ঘটে। এবং কাশ্মির রাজ্যে চক বংশীয় রাজত্বের সূচনা ঘটে। চক বাদশাহদের শাসনকালে সামান্য জনহিতকর কার্যাবলী সম্পাদন হলেও সাধারণভাবে এই বংশের পুরো শাসনামলটাই ছিল অন্যায়, বিবাদ-বিসম্বাদ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। শাসকশ্রেণী নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জনগণের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করত। বিশেষ করে পূর্ববর্তী শাসনকালে সৃষ্ট শিয়া ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সুন্নি মুসলিমদের ঝগড়া নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিকল্পিত বিবাদের ফলে বহু আলেম নিহত হন। একদিকে রাজ্যময় সংঘাত-বিবাদ চলত, আর বাদশাহ থাকতেন রং-তামাশায় মত্ত। চক বংশের বাদশাহ গাজী চকের মৃত্যুর পর হোসাইন শাহ ১৫৬৩ খ্রিস্টাব্দে ক্ষমতাসীন হন। ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে তিনি ভাই আলী শাহকে শাসনভার অর্পণ করেন। আলী শাহ পোলো খেলায় আসক্ত ছিলেন। একদিন ঈদগাহ ময়দানে পোলো খেলতে গিয়ে আহত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আলী শাহের মৃত্যুর পর ইউসুফ শাহ ক্ষমতা গ্রহণ করে নিজ-নামে মুদ্রার প্রচলন ও জুমার খোতবায় নিজের নাম জারি করার রসম প্রবর্তন করেন। এমনিভাবে একের পর এক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও পারিবারিক ঝগড়া-বিবাদ চলতে থাকে। এদিকে বাদশাহ ও আমির-ওমরাদের বিলাসবহুল জীবন-যাপনের পরিণতিতে দেশে রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও আর্থিক বিপর্যয় নেমে আসে। এই বিপর্যয়ে শিয়া মতাবলম্বী জৌলুশপ্রিয় শাসকশ্রেণী যেমন দায়ী, তেমনি এক শ্রেণীর সংকীর্ণমনা সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় গোষ্ঠিও কম দায়ী ছিল না। এমনিভাবেই রাজ্যময় অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার ফলে চক রাজবংশের পতন ঘটে এবং কাশ্মির উপত্যকা দিল্লির মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

www.pathagar.com

কাশ্মিরে মোগল শাসন

চক রাজবংশের শাসন-কার্যে বিশৃঙ্খলা, সীমাহীন অবিচার, অত্যাচার ও রাজবংশের জৌলুস ও বিলাসবহুল জীবন-যাপনে রাজ্যের সচেতন নাগরিকরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। এমতাবস্থায় তাঁরা দিল্লির মোগল বাদশাহ আকবরকে রাজ্যে হস্তক্ষেপ করার আবেদন করেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে সম্রাট আকবর একজন সেনা অফিসার মির্জা কাশেমের নেতৃত্বে কাশ্মির রাজ্যে আক্রমণ পরিচালনা করেন। মির্জা কাশেম অতি সহজেই রাজ্য দখলে সক্ষম হন। কথিত আছে যে, মোগল সম্রাটের কাশ্মির বিজয়কে শিয়া সম্প্রদায় "সীমাহীন অত্যাচার" আর সুন্নি জনগণ "শুভাগমন" হিসাবেই গ্রহণ করে। মোগল বাদশাহ এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যে, তাঁর ওপর অমুসলিম প্রভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। তিনি 'দ্বীন-ই-ইলাহি' নামের একটা উদ্ভট নতুন ধর্ম প্রচরের চেষ্টা করেন। স্বার্থান্বেষী এক শ্রেণীর লোক এই ধর্মে দীক্ষিত হতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। কিন্তু কাশ্মিরের জনগণ এই ধর্মকে পরিপূর্ণভাবেই প্রত্যাখ্যান করে। কেননা এখানে তখন হযরত মখদুম (র.), হযরত ইয়াকুব ছাকি (র.), বাবা দাউদ খাকি (র.)-এর মত প্রসিদ্ধ বুজর্গ ও ইসলাম প্রচারক উপস্থিত ছিলেন। কাশ্মিরি জনগণকে দ্বীন-ই-ইলাহির ফিতনা থেকে রক্ষার কাজে এই সমস্ত বুজর্গ ব্যক্তিরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসব পুণ্যবান ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় দ্বীন-ই-ইলাহির ফিতনা থেকে জনগণকে রক্ষা করতে সক্ষম হলেও সামাজিক জীবনে ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাঁরা সফল হতে পারেননি। জৌলুসপূর্ণ ও বিলাসবহুল জীবন-যাপনের বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার বিকাশ মূলত চক বংশের রাজত্বকালে শুরু হয়। আর মোগল শাসনকালে তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব রাজা-বাদশাহ সুরম্য রাজপ্রাসাদ, বিলাসবহুল অট্টালিকা তৈরি আর মোহনীয় বাগ-বাগিচাকেই উন্নতির একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করতেন। ফলে সাধারণ মানুষের উন্নতি ও কল্যাণের পরিবর্তে সরকারি অর্থ সম্পদ ব্যয়ে সুরম্য অট্টালিকা আর মনমোহনী বাগ-বাগিচা নির্মাণের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। জনগণের মধ্যে ইসলামি আদর্শিক চেতনার বিকাশ ও শিক্ষা উন্নয়নের কাজে তখন কোনও দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। এর ফলশ্রুতিতে কাশ্মির দ্বিতীয়বার অমুসলিম শাসনাধীনে চলে যায়। রাজপ্রাসাদ, অট্টালিকা আর বাগ-বাগিচা নির্মাণের কাজকেই পূর্ণ অগ্রাধিকার না দিয়ে দ্বীনের দাওয়াত ও দ্বীন প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি আদর্শের ব্যাপক প্রচার-প্রসারকে যদি প্রাধান্য দেওয়া হত, যা ছিল একটা মুসলিম রাষ্ট্রের বুনিয়াদি লক্ষ্য, তাহলে মুসলিম উম্মাহকে আজ এই পরিণতি প্রত্যক্ষ করতে হত না।

www.pathagar.com

শাসকশ্রেণীর ঔদাসিন্য দিন দিন জনগণকে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে থাকে। অশ্লীল উপমা প্রয়োগ ও লাগামহীন মানসিক লাম্পট্যকে সাহিত্যের উন্নতি বলে মনে করা হল। মুক্ত-চিন্তার নামে শুরু হল অশ্লীল সাহিত্য সৃষ্টি। এসব তো শুরু হয়েছিল চক শাসনামলেই, তার বিস্তৃতি ঘটে আকবর আর তাঁর দরবারি ফয়জি ও আবুল ফজলদের সহায়তায়। এই অবস্থা মুসলিম শাসকদের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকেও ডুবিয়ে ছাড়ে।

সম্রাট আকবর উনিশ বছরকাল কাশ্মির রাজ্য শাসন করেন। এই সময় কাশ্মির রাজ্যের সর্বত্র শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। পূর্ববর্তী শাসনকালে ব্রাহ্মণ এবং সুন্নি মুসলমানদের সঙ্গে যে বিমাতাসূলভ ব্যবহার করা হত, আকবর তা সম্পূর্ণ দূর করেন।

আকবরের পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গির দিল্লির শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তিনি ১৬০৬ থেকে ১৬৩৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সর্বমোট তেত্রিশ বছর শাসন করেন। জাহাঙ্গিরের শাসনকালের সবচাইতে বড় অবদান হল, তিনি অমানবিক সতীদাহ প্রথাকে কঠোর-হস্তে দমন করেন এবং চক শাসনামলে মুসলিম রমনীদের সঙ্গে হিন্দুদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইসলামবিরোধী প্রথাও রহিত করেন। একাধিকবার কাশ্মির ভ্রমণ করে তিনি জনগণের সুখ-দুঃখের খবর নিয়েছেন। বাদশাহ জাহাঙ্গিরের ইনতেকালের পর শাহজাহান সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি তাঁর পিতামহ ও পিতার তুলনায় ভিন্ন চরিত্রের লোক ছিলেন। প্রজা-সাধারণের কল্যাণ সাধনে তিনি ছিলেন সদা সোচ্চার। বাদশাহর প্রভাবে তাঁর প্রশাসকদের আচার-ব্যবহারও ছিল উন্নত ও সহমর্মিতাসুলভ। এতদসত্ত্বেও দুর্ভাগ্যবশত এই সময় কাশ্মির রাজ্যে চক শাসনকালের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পায়। শিয়া সম্প্রদায় ও সুন্নিদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে শান্তি-শৃঙ্খলারও অবনতি ঘটে।

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের কাশ্মির শাসন

আকবর, জাহাঙ্গির এবং শাহজাহানের শাসনকালে কাশ্মির রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যদিও উল্লেখযোগ্য উন্নতি লাভ করে, তথাপি ধর্মীয়, সামাজিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শাসকদের তুলনায় তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি। সৌভাগ্যের বিষয় হল, বাদশাহ আওরঙ্গজেব এই ঘাটতি পূরণে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেন। তিনি শুধু ব্যক্তি-জীবনেই একজন সৎ ও চরিত্রবান শাসক ছিলেন না, বরং গোটা রাষ্ট্র-যন্ত্রকেই ইসলামি আদর্শ মোতাবেক পরিচালনা করতেন। তিনি শাসনকালের পুরো সময়ই ইসলামি পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছেন। এই কাজে তিনি পূর্ণমাত্রায় সফলও হয়েছেন। তাঁর শাসনামলে কাশ্মির রাজ্য প্রভূত উন্নতি সাধন করে। ঐতিহাসিক বের্নিয়র আওরঙ্গজেবের সঙ্গে একবার কাশ্মির সফর করে বলেন, "কাশ্মিরিরা ভারতীয়দের চাইতে অধিক চালাক-চতুর। তারা কবিত্ব ও বিজ্ঞানের দিক দিয়ে ইরানিদের সমতুল্য"। এই সময় কাশ্মির রাজ্য শিল্প-সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হস্তশিল্পে যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে।

কাশ্মির রাজ্যে উত্তম শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও বিশ্বস্ত গবর্নর নিয়োগ করেন। এই সময় গবর্নররা জনগণের ওপর অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ণতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। জনগণের জান-মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধানে কোন প্রকার কসুর করতেন না। ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে এই পুণ্যবান শাসক ইন্তেকাল করেন। আওরঙ্গজেবের উনপঞ্চাশ বছরের শাসনকাল কাশ্মিরি জনগণের জন্য ছিল শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধির কাল।

আওরঙ্গজেবের ইনতেকালের পরপরই মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। রাজবংশে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। অবশেষে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাহাদুর শাহ উপাধি ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। এই সময় গোটা হিন্দুস্থানেই মোগল সাম্রাজ্য অভ্যন্তরীণ বিরোধ, বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। কাশ্মিরে তখন একপ্রকার প্রাপ্ত-ক্ষমতা (Proxy Rule) দিয়ে শাসনকার্য পরিচালিত হত। ফলে এখানকার প্রশাসন-ব্যবস্থাই হয়ে পড়ে এলোমেলো এবং আর্থিক দিক দিয়ে গোটা রাজ্য দেউলিয়ার শিকার হয়। কেননা দিল্লির শাসন-যন্ত্র বিকল হওয়াতে কাশ্মির রাজ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কোনও সময় তাদের ছিল না। প্রাকৃতিক নিয়মেই এই অবস্থার অনিবার্য ফলশ্রুতি ছিল, মোগলদের পরিবর্তে অন্য শক্তি রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করবে। সুতরাং ১৭৫৩ খ্রিস্টাব্দে আহমদ শাহ আবদালি তদানিন্তন মোগল গবর্নর আবুল কাশেমকে পরাজিত করে কাশ্মির দখল করেন।

www.pathagar.com

কাশ্মির উপত্যকায় আফগান শাসন

কাশ্মিরে আফগাান শাসনকাল ছিল ৬৭ বছর। এই সময় কাশ্মিরের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে আসে।

নিঃসন্দেহে এই বিপর্যয়ের সূচনা আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মোগল শাসকদের হাতেই হয়। কিন্তু আফগাান শাসকরা আরও বেশি স্বার্থপর, দুর্নীতিপরায়ন ও অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। যদিও দুই একজন আফগান গবর্নর এই অবস্থা পরিবর্তনের কিঞ্চিৎ চেষ্টা-তদবির করেছেন, তথাপি সাধারণভাবে আফগান-শাসকরা স্থিতিশীলতা আনার কাজে সম্পূর্ণভাবেই ব্যর্থতার পরিচয় দেন। লুটতরাজ, হত্যা, ছিনতাই এ সময় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ মানুষের জানমাল, ইজ্জত-আব্রুর কোনও নিরাপত্তা ছিল না। আমির-ওমরারা ছিলেন অবৈধ উপায়ে যেনতেনভাবে ধনসম্পদ সংগ্রহে লিপ্ত। গোটা রাজ্যের জনসাধারণ ছিল সদা ভীতসন্ত্রস্ত। জুলুম-পীড়নের অবর্ণনীয় এই দুর্বিষহ অবস্থার পরিবর্তন ও পরিত্রাণের জন্য কাশ্মিরি জনগণের কিছু অংশ এমন এক ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করে, যার বিষক্রিয়া ও নিদারুণ পরিণতি আজ অবধি ভোগ করতে হচ্ছে। নিঃসন্দেহে এ পথ ছিল আত্মহননের পথ। সেই ধ্বংস ও দাসত্বের শৃঙ্খল ছিন্ন করা আজও সম্ভব হয়নি। আফগান শাসকদের নির্যাতন-নিপীড়ন থেকে নিষ্কৃতির উপায় হিসাবে অদূরদর্শী কিছু লোক তদানিন্তন পাঞ্জাবের শিখ মহারাজা রঞ্জিত সিংকে কাশ্মির দখলের আমন্ত্রণ জানায়। এমনিভাবে কাশ্মিরে কেবল আফগান শাসনের অবসানই ঘটেনি, বরং পাঁচশত বছরের মুসলিম শাসনেরও পরিসমাপ্তি ঘটে।

কাশ্মির রাজ্যে শিখ শাসন : দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত

আমরা ইতোপূর্বে বর্ণনা করেছি, কাশ্মিরিরা আফগান শাসকদের জুলুম-নির্যাতনে অতীষ্ঠ হয়ে শিখ মহারাজা রঞ্জিত সিংকে কাশ্মির আক্রমণের আমন্ত্রণ জানায় এবং ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে শিখ মহারাজা রাজ্য দখল করে। এই উপত্যকার শিখ শাসনকালকে মুসলিম জাতির অতীত দুষ্কর্মের ও দায়িত্বহীনতার প্রকৃতি-নির্ধারিত শাস্তি বললে অত্যুক্তি হবে না। মুসলিম শাসকশ্রেণীর বিশেষভাবে এবং মুসলিম উম্মাহর সাধারণভাবে পাঁচশত বছরের শাসনকালে ইসলাম বিমুখতা, বিলাসবহুল জীবন-যাপন ও নানাবিধ দুষ্কর্মের পরিণতি হিসাবে যে শাস্তি পাওনা ছিল, তা-ই শিখ শাসনের রূপধারণ করে মুসলমানদের ওপর নিপতিত হয়। সুতরাং শিখ শাসনের সূচনা থেকে শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা সীমাহীন অত্যাচার-অবিচারের শিকার হয়। মসজিদে তালা লাগিয়ে আযানের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। বিভিন্ন খানেকাহ ও ইসলামি প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেওয়া হয়। গরু জবাই করা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হতো। একদিকে জীবিকা অর্জন কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদিকে কর ও জরিমানা আদায়ের কঠিন ব্যবস্থা জনজীবনকে অতীষ্ঠ করে তোলে। দুর্ভিক্ষ ও মহামারি ব্যাপক আকার ধারণ করে। কথিত আছে যে, একদিন রাতে শিখ গবর্নর রাজ-প্রসাদের ছাদে ওঠে

www.pathagar.com

শহরের অবস্থা অবলোকন করতে গিয়ে দেখতে পান যে, গোটা শহরের কোথাও একটা দীপ-শিখা পর্যন্ত প্রজ্বলিত নেই। এই অবস্থার বর্ণনা করতে গিয়ে একজন কবি বলেন,

"আহ, ইয়ে কেইছা দাউর থা, ওয়ায়ে ইয়ে কাইছি লোগ থী
জুলম কী উহ্ হাওয়া চালি, ছারে চেরাগ বুঝ গেয়ে।"

(হায়, এ কেমন শাসনকাল ছিল, পরিতাপের বিষয় এ কেমন শাসক ছিল, অত্যাচারের এমন বাতাস প্রবাহিত হল, সকল প্রদীপ নিভে গেল।)

শিখদের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ সীতারাম কোহলি বলেন, এই সময় কাশ্মির মুসলমানদের জন্য নরকতুল্য হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে লুঠতরাজ আর ছিনতাই অহরহ চলছিল। সর্বপ্রথম মুসলমানদের মসজিদ ও খানেকাহসমূহ ধ্বংস করা হয়, যাতে তাঁরা কোন কেন্দ্রে একত্রিত না হতে পারেন। সকল সরকারি পদ থেকে মুসলমানদের বিতাড়ন করে তদস্থলে হিন্দু ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদেরকে নিয়োগ করা হয়।

এই সময় এমন ছিল যে, যদি কোন শিখের হাতে মাত্র ষোল টাকা থাকত, তাহলে সে একজন মুসলমানকে হত্যা করতে পারত। ফসল কাটার সময় যে কোন শিখ সর্দার এসে দশ-ভাগের নয় ভাগ ফসল নিয়ে যেত। ঐতিহ্যবাহী কুটির-শিল্প ধ্বংস করে দেওয়া হল। হস্ত-শিল্পের ওপর শতকরা ছাব্বিশ ভাগ কর বসিয়ে এই শিল্পকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়া হয়। এমনিভাবে জুলুম-অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানোর পর প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে শিখ শাসনেরও একদিন চরম পতন আসে। গোটা রাজ্যকে ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ডোগরা শাসনের পথ উন্মুক্ত করে তাঁরা বিদায় নিতে বাধ্য হন।

www.pathagar.com

কাশ্মিরে ডোগরা শাসন : কেনা-বেচার সূচনা

শিখ শাসকদের সীমাহীন উৎপীড়নের শেষ পর্যায়ে জম্মুর একজন প্রভাবশালী জমিদার গোলাব সিং লাহোরে শিখ মহারাজের দরবারে উচ্চ পদে চাকরি গ্রহণ করেন। শিখ দরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে সুচতুর গোলাব সিং পতনোন্মুখ শাসকশ্রেণীর দুর্বলতা ও জনগণের ঘৃণা-বিদ্বেষকে কাজে লাগিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের একটা মীমাংসা চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তি মতে শিখরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে গোটা কাশ্মির ও তার অধিবাসিদেরকে ইংরেজদের হাতে সোপর্দ করে দেন। আর এই ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করতে গিয়ে ইংরেজরা গোলাব সিং-এর হাতে কাশ্মির রাজ্যকে বিক্রি করে দেন।

একটা জনপদের বিক্রয়মূল্য মাথাপিছু মাত্র বারো আনা

১৮৪৬ সালে একই সঙ্গে কাশ্মির ও তার অধিবাসিদের নিয়ে দুইটা সওদা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম সওদা ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে আর দ্বিতীয় সওদা হয় ডোগরা ও ইংরেজদের মধ্যে। প্রথম সওদার মূল্য দশ লাখ আশরাফি আর দ্বিতীয়টার মূল্য নির্ধারিত হয় পঁচাত্তর লাখ রূপি।

প্রথম ও দ্বিতীয় সওদা যথাক্রমে 'লাহোর চুক্তি' ও 'অমৃতস্বর চুক্তি' নামে ইতিহাস-খ্যাত। এমনিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ হিমালয়ান উপত্যকার আকাশ-চুম্বি পাহাড়, চির-সবুজ বনাঞ্চল, সুদৃশ্য সাগর-নদি-নালা, মিষ্টিপানির ঝর্ণাধারা-মোহিনী ঝিল, সবুজ-সতেজ-শ্যামল শষ্যক্ষেত, সুস্বাদু রসালু ফলভর্তি বাগিচা আর প্রতিভাধর জনগোষ্ঠি মাত্র পঁচাত্তর লাখ টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেয় গোলাব শিং-এর কাছে। বলা যায়, প্রতিজন কাশ্মিরির মূল্য নির্ধারিত হয় বারো আনা মাত্র। এই বিক্রয়-চুক্তির মাধ্যমে কাশ্মির নিয়ে যে কেনা-বেচার অমানবিক সিলসিলা শুরু হয়; আজ অবধি তা অব্যাহত রয়েছে। কাশ্মিরের মুসলিম জনগোষ্ঠি এক সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তির পূর্বক্ষণেই দ্বিতীয় উপনিবেশবাদের শিকারে পরিণত হয়ে আসছে।

অমৃতস্বর চুক্তি মোতাবেক কাশ্মির রাজ্য গোলাব সিং-এর হাতে বিক্রি হলেও ডোগরাদের কাশ্মিরে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। রাজ্যের সর্বশেষ শিখ গবর্নর শেখ ইমামুদ্দিনের নেতৃত্বে প্রবল প্রতিবাদ প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ও বাধা-বিপত্তির পরও ইংরেজদের সক্রিয় সহযোগিতায় গোলাব সিং রাজ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সফল হন। বস্তুত ইংরেজদের পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা না থাকলে হয়ত ডোগরা রাজার পক্ষে কাশ্মির শাসন সম্ভব হত না। কাশ্মিরের শাসনভার গ্রহণের পর বিক্রয়-চুক্তি ও ডোগরা শাসনবিরোধী আন্দোলনকারীদের নির্দয়ভাবে নিশ্চিহ্ন করার প্রক্রিয়া শুরু হয়।

মিল্লি ও আলী নামক দুই ব্যক্তি এই জবর-দখলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন করতে থাকেন। অবশেষে এই দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ডোগরা

www.pathagar.com

দরবারে উপস্থিত করা হয়। গোলাব সিং দুই মহান স্বাধীনতাকামীকে উল্টো ঝুলিয়ে জীবন্তাবস্থায় তাদের চামড়া ছিলানোর নির্দেশ দেন। এই করুণ হৃদয়বিদারক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে রাজকুমার দরবার ত্যাগ করে চলে যান। এতে গোলাব সিং রাগান্বিত হয়ে এই বলে রাজকুমারকে সতর্ক করে দেন যে, "তোমার মধ্যে যদি এমন দৃশ্য দেখার সাহস না থাকে, তা হলে যুবরাজের পদ থেকেই অপসারণ করে দেওয়া হবে"। ডোগরা শাসনের সূচনালগ্নের এই পাশবিক ঘটনা থেকেই প্রমাণিত হয়, এখানে মুসলমানদের ওপর কী পরিমাণ উৎপীড়ন-অত্যাচার চলেছে।

সীমাহীন জুলুম-অত্যাচারের সঙ্গে রাজ্যশাসন করে ১৮৫৬ সালে মহারাজা গোলাব সিং মৃত্যুবরণ করেন। গোলাব সিং-এর মৃত্যুর পর পুত্র রনবীর সিং ক্ষমতাসীন হন। রনবীর সিং ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মুসলমানদের ওপর এমন নজিরবিহীন অবিচার পরিচালনা করেন, যা অতীতের সকল অত্যাচার-অবিচারকেও ম্লান করে দেয়। তাঁরই শাসনামলে শ্রীনগর শহরে মুসলিম শ্রমিকরা দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে এক জনসভার আয়োজন করেন। এই জনসভার অপরাধে ২৮ জন শ্রমিকনেতাকে সমুদ্রে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। এই সময় হাজার হাজার কাশ্মিরি মুসলমান পাঞ্জাবে হিজরত করতে বাধ্য হন। ১৮৩২ সালে একজন ব্রিটিশ কর্নেল ইসলাম গ্রহণ করে এক কাশ্মিরি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের পর ইংরেজ কর্নেল স্ত্রীকে নিয়ে ব্রিটেনে চলে যান। দীর্ঘদিন পর রনবীর সিং-এর শাসনকালে কর্নেল দম্পতির এক সন্তান রবার্ট কাশ্মির ভ্রমণে আগমন করেন। এই ভ্রমণকালে মি. রবার্ট "Miss Government of Kashmir" নামে একটা বই লিখেন। বইতে রবার্ট ডোগরা শাসনে মুসলমানদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ তথা জুলুম-অত্যাচারের কাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন। এই অত্যাচারকাহিনী লিপিবদ্ধ করার অপরাধে রবার্টকেও হত্যা করা হয়। ডোগরা মহারাজ এতই মুসলিম-বিদ্বেষী ছিলেন যে, তাঁদের ছায়া পর্যন্ত তাঁর কাছে ছিল অসহনীয়। ভোরে কোন মুসলিম-দর্শনকে অমঙ্গলকর মনে করে তাঁকে হত্যাযোগ্য বলে মনে করা হত। তাঁর মৃত্যুশয্যায় দিল্লির বিজ্ঞ হাকিম মাহমুদ খানকে মহারাজের চিকিৎসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। ঘটনাচক্রে হাকিম যখন রাজপ্রাসাদে পৌঁছেন, তখন ভোরবেলা। বিজ্ঞ হাকিম প্রভাতেই তাঁর নাড়ি পরীক্ষা করে রোগ নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে এই বলে হাকিমকে রাজার কাছে যেতে বারণ করা হয় যে, ভোর বেলায় মহারাজ কোন মুসলমানের মুখ দেখা অমঙ্গলকর মনে করেন। দ্বিপ্রহরে যখন পরিদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়, ততক্ষণে মহারাজ ইহধাম ত্যাগ করেন। মহারাজার পানীয় জল 'চশমাশাহি' নামক ঝর্ণা থেকে এমন সতর্কতার সঙ্গে আনা হত, যাতে কোন মুসলমানের ছায়াও ঐ জলপাত্রে না পড়ে। অকস্মাৎ যদি ব্যতিক্রম ঘটত, তাহলে সেই মুসলমানকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হত।

www.pathagar.com

দেশ বিক্রির অনুশোচনা: ডোগরা শাসকের ক্ষমতা প্রত্যাহার ও পুনর্বহাল

ইংরেজরা কাশ্মির রাজ্য গোলাব সিং-এর হাতে বিক্রি করে দিলেও তাঁদের বিশেষ রাজনৈতিক সুবিধা হাসিলের নিমিত্তে এই এলাকায় নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষার চেষ্টা করতেন। এই অবস্থায় রুশদের অগ্রসরমান প্রভাবে ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার ১৮৭০ সালে মহারাজা রনবীর সিং-এর সঙ্গে একটি ব্যবসা-চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, পঁচাত্তর লাখ টাকার বিনিময়ে রাজ্য বিক্রির সওদাকে তাঁরা পরবর্তীতে অদূরদর্শি সিদ্ধান্ত বলে মনে করতেন। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পরিস্থিতির কারণে ব্রিটিশ সরকার গিলগিতে পলিটিকাল এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮৭ সালে রনবীর সিং-এর মৃত্যুর পর প্রতাপ সিং রাজ-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। অচিরেই ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে, মহারাজ প্রতাপ সিং রাশিয়ার আজ্ঞাবহে পরিণত হয়ে ওঠেছেন, তখনই তাঁরা শ্রীনগরে ব্রিটিশ রেসিডেন্সি কায়েম করে রাজ্য শাসনের মূল ক্ষমতা স্টেট কাউন্সিলের ওপর ন্যস্ত করেন। এবং এতে করে প্রকৃতপক্ষে মহারাজা প্রতাপ সিং ক্ষমতাহীন রাজায় পরিণত হন। এই সময় বৃটিশ সরকার কমিউনিজমের বিপদাশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়ে। তাঁরা দেখতে পান যে, সমাজতান্ত্রিক প্রচার-প্রপাগান্ডা রুশ-সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতবর্ষেও পদার্পন করছে। এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদ্বয়ে রুশ হামলার সম্ভাবনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্থায় রুশ সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্রিটিশ সামরিকবাহিনী মোতায়েন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রতাপ সিং ব্রিটিশ সরকারের এই ইচ্ছা বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে সম্মত হন। এই সম্মতির পুরস্কার হিসাবে ভাইস রয় লর্ড চেম্বফোর্ড প্রতাপ সিং-এর প্রশাসনিক ক্ষমতা পুনর্বহাল করে দেন। ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর মহারাজের মুসলিম-বিদ্বেষ দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। জুলুম-বর্বরতার নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। জমির মালিকানা আইনের পরিবর্তন করে প্রতাপ কোড (Pertab Code) নামের নতুন আইনের মাধ্যমে মুসলমানদের ভূমিহীন করার ব্যবস্থা আর রাজবংশ, তোষামোদি ও খোশামোদিদের জন্য ভূ-মালিকানা প্রতিষ্ঠার বিশেষ ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। প্রতাপ সিং-এর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন হরি সিং। ১৯২৬ সালে মহারাজা হরি সিং রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন। হরি সিং ক্ষমতাসীন হয়েই মুসলিম নিধনকার্য চালাতে থাকেন। রাজ্যে ডোগরা ও রাজপুত ছাড়া কোনও মুসলমানের জন্য অস্ত্র বহণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এবং মুসলমানদের অধিকার আদায়ের সকল প্রচেষ্টা কঠোর হাতে দমন করার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এমন কী, কোনও মুসলমানের হাতে ছয় ইঞ্চির ছুরি পাওয়া গেলেও গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হত। এমনিভাবে একের পর এক রাজন্যের পরিবর্তন হলেও মুসলিম উৎপীড়নই ছিল তাঁদের রাজধর্ম। সেই একই মুসলিম-রক্তস্নাত তরবারি আর সেই একই জল্লাদ সদা সক্রিয় থাকত।

www.pathagar.com

বিদ্রোহের সূচনা : আত্মপরিচয়ের দিক-নির্দেশনা

সাধারণত কাশ্মির সমস্যার ব্যাপারে এই কথা মনে করা হয় যে, ১৯৪৭ সালে জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যে ভারতীয় জবর দখলের পর থেকেই এই সমস্যার সূচনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮১৯ সালে এই উপত্যকার মুসলিম শাসনের অবসান ও শিখ শাসনের সূচনালগ্নেই কাশ্মিরি জনগণের পরাধীনতার সুদীর্ঘ কালোরাতের সূত্রপাত ঘটে। আর ১৮৪৬ সালের 'অমৃতস্বর চুক্তির' মাধ্যমে সেই কালো রাত গভীর থেকে গভীরতর হয়ে ওঠে। শিখ ও ডোগরা শাসনের সুদীর্ঘ এক শতাব্দিকাল কাশ্মিরি মুসলমানদের ওপর যে অমানবিক বর্বরতা চলেছে, তার দৃষ্টান্ত বিরল। তখনকার মন্ত্রিপরিষদের একজন ইংরেজ সদস্য বলেন, "জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দারিদ্রের অক্টোপাশে বন্দি জনগণের সঙ্গে পশুর মত ব্যবহার করা হয়"। শতাব্দিকালব্যাপী পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ মুসলিম জনগণ ভয়-ভীতি আর নৈরাশ্যের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে থাকে। আত্মবিস্মৃতপ্রায় এই জাতি পুনরায় জেগে ওঠবে, জুলুম-অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস পাবে, তা কোনও দিন কল্পনাও করা যেত না।

অত্যাচারী ডোগরা শাসনের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎপ্রতিরোধের সূচনার কথা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি। এই প্রতিরোধ-আন্দোলনের প্রভাব সবচাইতে বেশি পরিলক্ষিত হয় সে সব কাশ্মিরি যুবকদের মধ্যে, যাঁরা শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও উপমহাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা লাভ করে সদ্য দেশে ফিরেছেন। তাঁদের সচেতন প্রচেষ্টায় ক্রমান্বয়ে জনগণের মধ্যে স্বকীয় চেতনাবোধের সৃষ্টি হতে থাকে। এ ছাড়া ডোগরা শাসনের সীমাহীন বর্বরতার কারণে এমন কিছু লোমহর্ষক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়, যা কাশ্মিরি জনগণকে নিদ্রাভঙ্গে বাধ্য করে। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করে। আর এই চেতনাই একদিন স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এ ঘটনাপ্রবাহ একদিকে যেমন হয় আজাদি আন্দোলনের সূচনাপর্ব, তেমনি আত্মপরিচিতির আলামত ও দিক-নির্দেশনাও।

ডোগরা শাসনের কালো অধ্যায়ে যে-সব ঘটনা কাশ্মিরি জনগণকে আত্মপরিচয়ে বলীয়ান করে তোলে, তার মধ্যে ঈদের খোতবা বন্ধ করা অন্যতম। ২৯ এপ্রিল ১৯৩১, ঈদের ময়দানে ইমাম সাহেব হযরত মুসা (আ.) ও ফিরাউনের কাহিনী বর্ণনা করছিলেন। এমন সময় ডোগরা ডি. আই. জি মনে করলেন যে, ফিরাউন বলতে আসলে ডোগরা রাজা হরি সিংকে বোঝানো হচ্ছে। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই খোতবা বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এই অন্যায় নির্দেশ শত বছরের ঘুমিয়ে পড়া কাশ্মিরি জনগণের জাগরণের ডঙ্কার রূপ ধারণ করে। গোটা কাশ্মির প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। এই আন্দোলনের নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাস ঘটনার গুরুত্ব ও প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর জীবনচরিতে বলেন, "প্রকৃত ব্যাপার হল এই, দিনটি মুসলমানদের জন্য নাজাতের নির্দেশ রাখে। শতাব্দির নির্লিপ্ত চেতনা সামুদ্রিক তুফানের মত পুনঃউত্থিত হয়।"

www.pathagar.com

ডোগরা শাহির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অব্যাহত থাকে। ইতোমধ্যে জম্মুর কেন্দ্রীয় কারাগারে একজন হিন্দু কনস্টেবল লভুরাম কর্তৃক পবিত্র কোরআন অবমাননার ঘটনায় গোটা উপত্যকার জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এই বিক্ষোভ-প্রতিবাদ শহর-বন্দর থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলেও প্রসারিত হয়। শ্রীনগর জামে মসজিদ ছিল এই আন্দোলনের কেন্দ্র। আর শেখ আব্দুল্লাহ মীর ওয়ায়েজ কাশ্মির মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফ ও চৌধুরী গোলাম আব্বাস ছিলেন এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ। খোতবা প্রদানে বাধা দান ও কোরান অবমাননার এই ঘটনা দু'টি মুসলমানদের মনে নতুন স্পন্দন সৃষ্টি করে। জাগরণের এক সীমাহীন চেতনায় যেন প্রচণ্ড আলোড়নের সূচনা হয়। ডোগরা শাহির বিরুদ্ধে এই মুসলিম জাগরণ তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ উর্মিমুখর সমুদ্রের রূপ ধারণ করে।

এই আন্দোলনের দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল "খানকাহ মোয়াল্লাহ"। এই স্থান কাশ্মির উপত্যকার ইসলামি দাওয়াতের অগ্রপথিক সাইয়েদ আলী হামদানির প্রতিষ্ঠিত ইসলামি কেন্দ্র। এখান থেকেই আন্দোলনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হত এবং জনগণ এই ঐতিহাসিক কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে আত্মিক ও নৈতিক প্রেরণা লাভ করতেন। এই জাগরণে খানকাহ মোয়াল্লাহর ভূমিকা সম্পর্কে শেখ আবদুল্লাহ বলেন, "১৯৩১ সালের ২১ জুন আমাদের আহবানে কাশ্মিরি মুসলমানদের এক জাঁকজমকপূর্ণ জনসমুদ্র খানকাহ মোয়াল্লাহর পাদদেশে জমায়েত হয়। এই সমাবেশকে কাশ্মির স্বাধীনতা আন্দোলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ও সূচনা বলা যেতে পারে। কতই না সৌভাগ্যের বিষয় যে, সেই পবিত্র ও বরকতপূর্ণ খানেকার ছায়াতলেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বুনিয়াদ রাখা হয়, যা ছয়শত বৎসরকাল পূর্বের ইসলামি দাওয়াতের অগ্রপুরুষ সাইয়েদ আলী হামদানি (র.)-এর সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত।"

এই বিশাল সমাবেশেই সূচিত হয় সেই আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক ঘটনা, যা উপত্যকার স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। খানকাহ মোয়াল্লাহর জনসভা শেষে আবদুল কাদির নামক এক পাঠান যুবক সমবেত জনতার উদ্দেশে আবেগ-আপ্লুত ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন। উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় যুবক বলেন, "মুসলিম জনতা ! সময় এসে গিয়েছে, এখন ইটের জবাব পাথর দিয়ে দিতে হবে। স্মারকলিপি আর আবেদন-নিবেদনে জুলুম-অত্যাচার বন্ধ হবে না; হবে না কোরান অবমাননার কোন প্রতিকার। তোমরা নিজ-পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াও, নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও"। যুবক রাজ-প্রাসাদের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে আরও বলেন, "এই রাজমহলের 'ইটসে ইট বাজাদো"'। এই ক'টা বাক্যই অত্যাচারী শাসকের কাছে উক্ত যুবকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ আনার জন্য যথেষ্ট ছিল। ১৩ জুলাই, ১৯৩১-এ শ্রীনগর কেন্দ্রীয় কারাগারে যুবকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মামলার শুনানি আরম্ভ হয়। যুবক আবদুল কাদিরের সঙ্গে কাশ্মিরি জনগণের রং, বংশ, ভাষা ও বাসস্থানের কোন সম্পর্ক ছিল না। একমাত্র ইসলামি আদর্শ ও বিশ্বাসের ঐকতানে সমস্ত উপত্যকার মুসলিম জনতা তাঁর সমর্থনে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে আসে। জনতা প্রতিবাদ বিক্ষোভে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। আদালতের চারপাশে তৌহিদি জনতার এক ঈমানদীপ্ত দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। লাখো জনতা মকদ্দমার শুনানি শোনার জন্য আদালতের

www.pathagar.com

সামনে এসে ইসলামি ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের এক অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত পেশ করে। ইতোমধ্যে নামাজের সময় হলে একজন যুবক আজান দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যান। এমন সময় পুলিশের গুলি এসে তাঁর বক্ষচ্ছেদ করে চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই যুবক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে শাহাদাত বরণ করেন। এর পর দ্বিতীয় যুবকের আগমনও একই পরিণতির শিকার হয়। এমনিভাবে একের পর এক করে আজানের শেষ শব্দ পর্যন্ত বাইশ জন মুসলিম যুবসন্তান একই স্থানেই শাহাদাতের অমৃত-স্বাদ গ্রহণ করেন। আর সত্যের সাক্ষ্য প্রদানে, সত্য পথের জন্য জীবনদানের ইতিহাসে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সংযোজন ঘটে। সত্য পথে জীবন উৎসর্গকারী এসব যুবকের চেতনা ও অনুভূতি শেষ বাক্যেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আহত যুবক উপস্থিত শেখ আবদুল্লাহকে লক্ষ্য করে বলেন, "আমরা আমাদের দায়িত্ব পূর্ণ করেছি। এখন আপনাদের পালা। মুসলিম জাতিকে বলবেন, তাঁরা যেন দায়িত্ব পালনে ভুল না করেন"।

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষিত রচনার এসব ঘটনা যেমন বিনা কারণে সংঘটিত হয়নি, এর প্রভাবও সমাজ-জীবনে অকার্যকর হয়নি। ইসলামি আদর্শ ও চেতনাবোধই এই সংগ্রামের মূল উপাদান ছিল। ফলে গোটা উপত্যকার আনাচে কানাচে নারী-পুরুষ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে আন্দোলনের পতাকাতলে জমায়েত হন। কাশ্মিরি নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাস এই আন্দোলনের ইসলামি বৈশিষ্ট নিরূপণ করতে গিয়ে বলেন, "কাশ্মির স্বাধীনতা আন্দোলনের বুনিয়াদই ছিল ইসলামি আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের শ্লোগান থেকে শুরু করে দুনিয়ার সাহায্য সহযোগিতা সব কিছুই ইসলামের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত ছিল।" এই পৈশাচিকতার প্রতিবাদে ভারতজুড়ে কাশ্মির দিবস পালন করা হত।

বস্তুত ইসলামি আদর্শের চেতনা ও পরিচিতিই এই সংগ্রামকে জনগণের আত্মার প্রতিধ্বনিতে পরিণত করে। যার ফলে অতি দ্রুত এই আন্দোলন এতই জনপ্রিয়তা লাভ করে যে, যার তুলনা বিরল। ইসলামের আদর্শিক চেতনাবোধ ও তার জীবনিশক্তিই শতাব্দির অবচেতন কাশ্মিরি মুসলমানদের মনে নবপ্রেরণা ও নতুন জীবন দানে সক্ষম হয়। আর ডোগরা শাহির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের শক্তি-সাহস সঞ্চার করে। মনে করা হয় যে, অচিরেই বুঝি ডোগরা সাম্রাজ্য ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে; সঙ্গে সঙ্গে প্রজ্জ্বলিত হবে ইসলামের দীপশিখা।

www.pathagar.com

রাজ্যের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনের মর্মান্তিক পরিণতি

ডোগরা শাসনের অকথ্য নির্যাতন, অবিরাম অত্যাচার ও ধর্মীয় স্বাধীনতায় অন্যায় হস্তক্ষেপ ইত্যাদির ফলে জনগণের মধ্যে যে অকল্পনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তাতে ব্রিটিশ সরকারেরও টনক নড়ে। ফলে বারট্রান্ড গ্লান্সির নেতৃত্বে মুসলমানদের ওপর পরিচালিত এসব অন্যায়-অনাচারের নিরীক্ষা ও প্রতিকারের উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের সাক্ষ্য-প্রমাণসহ রিপোর্ট প্রকাশের ফলে বহির্বিশ্বও প্রথমবার জানতে পারে যে, এই এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠির ওপর কী পরিমাণ অন্যায় অবিচার পরিচালিত হচ্ছে।

অল জম্মু এন্ড কাশ্মির ন্যাশনাল কনফারেন্স

১৯৩৩ সালে কাশ্মির রাজ্যের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত যুবক একত্রিত হয়ে "অল জম্মু এন্ড কাশ্মির মুসলিম কন্‌ফারেন্স" নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন; শেখ আবদুল্লাহ সভাপতি ও চৌধুরী গোলাম আব্বাস সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। এ'ছাড়া কাশ্মির রাজ্যের প্রভাবশালী ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মীর ওয়ায়েজ মাওলানা মোহাম্মদ ইউসুফের সক্রিয় সহযোগিতাও এই সংগঠনের সঙ্গে থাকে। এই ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা যদিও শেষ পর্যন্ত স্থায়ী থাকতে পারেনি, তথাপি কাশ্মিরিদেরকে সংগঠিত করার ব্যাপারে এর ভূমিকা ফলপ্রসূই প্রমাণিত হয়েছে।

মুসলিম কনফারেন্সের প্রতিষ্ঠা রাজ্যের জনগণকে একতাবদ্ধ করা, অধিকার-সচেতনতা সৃষ্টি ও স্বাধিকার আন্দোলনের পথে এক মাইলফলক বলা যায়। জনগণের মধ্যে মুসলিম চেতনাবোধ ও ইসলামি অনুভূতি সৃষ্টিতে এই তিন নেতার ভূমিকা ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। যে গতিতে ডোগরা শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন অগ্রসর হচ্ছিল, সেই গতি ও নেতৃত্বের ঐক্য অব্যাহত থাকলে অত্যাচারী ডোগরা শাহির পতন ছিল অনিবার্য। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, কাশ্মিরি জনগণের সে আশার গুঁড়ে বালি পড়ে। অভ্যন্তরীণ অনৈক্য ও বহিঃষড়যন্ত্র এবং কিছু নির্বোধ স্বজনের অবিবেচনাপ্রসূত কার্যকলাপের কারণে এই পর্যায়ের আন্দোলন মর্মান্তিক ব্যর্থতার শিকার হয়।

www.pathagar.com

ওপরে বর্ণিত স্বাধিকার আন্দোলন– যার নেতৃত্ব দিচ্ছিল মুসলিম কনফারেন্স– যে পরিমাণ অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়ে জনপ্রিয়তা ও শক্তি সঞ্চয় করছিল, ঠিক একই গতিতে অনৈক্য ও অধঃপতনের শিকার হয়।

মুসলিম কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লাহ ও ধর্মীয় নেতা মীর ওয়ায়েজ মাওলানা ইউসুফের ঐক্য ও সহযোগিতা এই আন্দোলন ও সংগঠনকে গণভিত্তি দানে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। কাশ্মিরে মীর ওয়ায়েজকে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য করা হয়। বলা যায়, কোনও কোনও ক্ষেত্রে নবীর পরই তাঁকে মর্যাদা দান করা হত। শেখ আবদুল্লাহ ও মীর ওয়ায়েজের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কোন্দল ও অনৈক্য অবর্ণনীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিছক নেতৃত্বের কোন্দল একটা জাতীয় স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে অপূরণীয় ও ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনে।

কাশ্মিরি মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র সংগঠন মুসলিম কনফারেন্সের রাজনৈতিক আদর্শচ্যুতি ছিল তার পতনের অন্যতম প্রধান কারণ। ইসলামি আদর্শিক চেতনায় সমৃদ্ধ মুসলিম জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারাই ছিল মুসলিম কনফারেন্সের রাজনৈতিক আদর্শ। এবং সমসাময়িককালের ডোগরা শাসনের বিরুদ্ধে সংঘটিত আন্দোলনও ছিল ইসলামি আদর্শ ও চেতনায় উজ্জীবিত। কিন্তু, কাশ্মিরের কিছু পণ্ডিত এই উদীয়মান আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। বিশিষ্ট কাশ্মিরি পণ্ডিত ও সাংবাদিক প্রেমনাথ বজ্জাজ ছিলেন এর পুরোধা। এই আন্দোলনকে সেবোটেজ করার প্রস্তুতি মূলত ১৯৩৩ সালে আন্দোলনের সূচনালগ্নেই শুরু হয়, যখন পণ্ডিত প্রেমনাথ চশমা শাহি নামক পার্কে দীর্ঘ ছয় ঘণ্টাব্যাপী শেখ আবদুল্লাহর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। এর পর থেকে ধীরে ধীরে শেখ আবদুল্লাহর মন-মস্তিষ্কের ওপর পণ্ডিত প্রেমনাথের সেক্যুলার চিন্তাধারার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। অগ্রসরমান এ আন্দোলনকে ইসলাম ও মুসলিম পরিচিতির পরিবর্তে 'সোস্যালিজম, সেক্যুলারিজম ও ন্যাশনালিজম' আদর্শে রূপান্তরিত করার জন্য মি. নাথ আদাজল খেয়েই শেখ সাহেবের পেছনে লেগে থাকেন। অবশেষে শেখ আবদুল্লাহ সেক্যুলার কাশ্মিরি জাতীয়তাবাদের রঙে রঙিন হয়ে পড়েন।

এই প্রসঙ্গে শেখ আবদুল্লাহ বলেন, "সত্য কথা হল এই যে, ঐক্যবদ্ধ সেক্যুলার প্লাটফরম তৈরির বীজ সেই দিনই বপন করা হয়েছিল, যেদিন পণ্ডিত প্রেমনাথের সঙ্গে চশমা শাহি পার্কে সাক্ষাতে মিলিত হই"। মরহুম শেখ আবদুল্লাহর এই উক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ পরিবর্তনে মি. নাথের প্রভাব কী পরিমাণ কার্যকর ছিল। উপরন্তু ১৯৩৭ সালে আব্দুল্লাহ-নেহেরু সাক্ষাত কাশ্মির রাজ্যের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে সবচাইতে বেশি কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ বামপন্থী নেতা মিয়া ইফতিখার উদ্দিনের প্রচেষ্টায় লাহোর রেল স্টেশনে এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়। পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু সীমান্ত প্রদেশ সফরের সময় শেখ আবদুল্লাহকেও তাঁর সফরসঙ্গি করেন। সীমান্ত প্রদেশ সফর শেষে শেখ সাহেব পররঙে রঙিন হওয়া রঙ্গহীনের রূপ ধারণ করেন। এই যাত্রায় তিনি "শেরে কাশ্মির"-এর পরিবর্তে "কাশ্মিরি গান্ধি" হয়ে ঘরে ফিরেন। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মিরি

www.pathagar.com

মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন যেভাবে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল এবং এর পশ্চাতে ইসলামি আদর্শ-চেতনা যে পরিমাণ রস-শক্তি সঞ্চালন করছিল, তা কংগ্রেস নেতৃত্বের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই কথা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, কাশ্মির রাজ্যের এই আন্দোলন যদি ইসলামি পরিচয়ে অগ্রসর হয়, এর সফলতার অনিবার্য পরিণতিতে একদিকে যেমন ডোগরা শাসনের অবসান হবে, অন্যদিকে প্রস্তাবিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনেও 'অগ্রসর-মাইলফলক' প্রমাণিত হবে। কাশ্মিরি সন্তান আল্লামা ইকবাল কর্তৃক প্রস্তাবিত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও তখন দানা বেঁধে ওঠেছিল। এছাড়া মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনায় সমৃদ্ধ এই আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছার অর্থই হল কংগ্রেসের 'ভারত জাতীয়তার' রাজনৈতিক আদর্শের পথে বিরাট অন্তরায়। ফলে অখণ্ড ভারতের চিন্তাও ভেস্তে যাবে। সুতরাং তখন থেকেই এর মোড় পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। অধিকন্তু দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে প্রস্তাবিত যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছে, সেই পাকিস্তানের নকশায় জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনাও এখন থেকেই রোধ করা দরকার। এই আন্দোলনকে আতুর ঘরেই বিনষ্ট করার পশ্চাতে কাশ্মিরি পণ্ডিত ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নেতাদের দুরভিসন্ধিমূলক ভূমিকা ছাড়াও কাদিয়ানি সম্প্রদায়ও এর অংকুর বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উপমহাদেশের অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে এই সম্প্রদায় নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান নিলেও কাশ্মির রাজ্যের এ পর্যায়ের আন্দোলনে তারা ছিল সক্রিয়। "কাশ্মির আমারই উম্মতের হাতে বিজয় হবে"– কথিত মির্জা গোলাম আহমদের এই উক্তি বাস্তবায়নের পক্ষে তারা প্রথমেই এই আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। যাতে করে কাশ্মিরে একটা কাদিয়ানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হয়। কিন্তু যখনই তারা বুঝতে পারে যে, এখানকার সচেতন মুসলিম জনগোষ্ঠি তাদের এই স্বপ্ন সফল হতে দেবে না, তখনই তারা আন্দোলনকে অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল ও বিনষ্ট করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। কাশ্মিরি মুসলমানদের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, অবশেষে শেখ আবদুল্লাহ চতুর্মুখী ষড়যন্ত্রের জালে আবদ্ধ হয়ে যান। এবং "অল জম্মু এন্ড কাশ্মির মুসলিম কনফারেন্স"কে "ন্যাশনাল কনফারেন্স" নাম দিয়ে সেক্যুলার কাশ্মিরি জাতীয়তার ভিত্তিতে নতুন রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষা নেন। শ্রীনগর জামে মসজিদ আর খানেকাহ মোয়াল্লার চত্বরে দাঁড়িয়ে হাজার হাজার তৌহিদবাদী জনগোষ্ঠিকে মুসলিম জাগরণের বাণী শোনাতেন যে জন, যাঁর হৃদয়স্পর্শী মধুর সুরের কোরাআন তেলাওয়াত শুনে মুসলমানরা আকণ্ঠ ঈমানী স্বাদ গ্রহণ করতেন, করতেন আজাদি-চেতনার জ্বালানী সঞ্চয়, সেই শেখ আবদুল্লাহ সোস্যালিজম, ন্যাশনালিজম ও সেক্যুলারিজমের পতাকা নিয়ে নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সুতরাং তিনি তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টাকে কাশ্মিরি মুসলমানদের ইসলামি আদর্শ লালিত স্বতন্ত্র পরিচিতির পতাকাবাহী মুসলিম কনফারেন্সকে কাশ্মিরি জাতীয়তার ভিত্তিতে ন্যাশনাল কনফারেন্সে পরিণত করার কাজে নিয়োজিত করেন। প্রথম প্রথম শেখ সাহেবকে এই প্রচেষ্টার কঠোর বিরোধিতার

www.pathagar.com

সম্মুখীন হতে হয়। বিশেষ করে দলীয় সেক্রেটারি চৌধুরী গোলাম আব্বাস এই কার্যক্রমের তুমুল বিরোধিতা করেন। অবশেষে ১১ জুন, ১৯৩৯ সালে শ্রীনগর জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত দলীয় সভায় শেখ আবদুল্লাহ এই মর্মে লিখিত প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, মুসলিম কনফারেন্সকে ন্যাশনাল কনফারেন্সে রূপান্তর করা মানে ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের অনুকরণ নয়; নয় মুসলিম লীগের বিরোধিতা। শেখ সাহেবের এই ওয়াদার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বৈঠকে মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে 'ন্যাশনাল কনফারেন্স' প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করা হয়। কিন্তু শেখ আবদুল্লাহর প্রদেয় লিখিত প্রতিশ্রুতির কালি শুকাতে না শুকাতেই তিনি স্বমূর্তিতে প্রকাশিত হন। ২৯ ফেব্রুয়ারি শেখ আবদুল্লাহর অল ইন্ডিয়া স্টেটস পিপলস কংগ্রেসে যোগদান, একই সনের মার্চ মাসে ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় অংশগ্রহণ, এবং মে মাসে কংগ্রেস সভাপতি জওহর লাল নেহেরুকে কাশ্মির রাজ্যে সফরের আমন্ত্রণ ও রাজোচিত সম্বর্ধনা– এসব ঘটনায় দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাশ্মির ন্যাশনাল কনফারেন্স মূলত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসেরই রাজ্যশাখায় পরিণত হয়েছে।

www.pathagar.com

মুসলিম কনফারেন্সের পুনরুজ্জীবন ও পাকিস্তান প্রস্তাব

১৯৩৪ সালের দিকে মুসলিম লীগ নেতা নওয়াব বাহাদুর ইয়ার জংগ কাশ্মির সফরে যান। ডোগরা সরকার এই সফরের ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করলে তাঁকে শ্রীনগর থেকেই ফিরে আসতে হয়। অতঃপর কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ কাশ্মির সফর করেন। এই সফরকালে মি. জিন্নাহ্ শেখ আবদুল্লাহ্ ও চৌধুরী গোলাম আব্বাসকে একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এদিকে চৌধুরী গোলাম আব্বাস ও অন্যান্য মুসলিম নেতা শেখ আব্দুল্লাহকে তাঁর প্রতিশ্রুতি মত কাশ্মির ন্যাশনাল কনফারেন্সকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের রাজনীতি অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখার শত চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। এই সময়ই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক কর্তৃক উত্থাপিত পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হয়। কাশ্মিরি মুসলিম জনগোষ্ঠির পক্ষে সরদার ফতেহ্ মোহাম্মদ, খাজা আবদুর রহিম ও মাওলানা গোলাম হায়দার এই অধিবেশনে যোগদান করে পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করেন। এর অল্পদিন পরই ১৯ এপ্রিল চৌধুরী গোলাম আব্বাসের নেতৃত্বে অল জম্মু এন্ড কাশ্মির মুসলিম কনফারেন্সকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এবং একই সঙ্গে পাকিস্তান প্রস্তাব, মি. জিন্নাহ ও মুসলিম লীগের সঙ্গেও একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। এমনিভাবে মুসলিম কনফারেন্সের পুনরুজ্জীবনের ফলে রাজ্যের স্বাধীনতা আন্দোলনেও নব প্রেরণার সঞ্চার ঘটে, যা ন্যাশনাল কনফারেন্সে রূপান্তরের কারণে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল। এবং পুনরায় মুসলমানদের সবচেয়ে মজবুত ও জনপ্রিয় সংগঠনে রূপান্তরিত হয়। মুসলিম কনফারেন্সের বার্ষিক সম্মেলনে কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অংশগ্রহণ করেন এবং এই সভায় বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেন, "আমি কাশ্মিরি মুসলিম জনগণকে চৌধুরী গোলাম আব্বাসের নেতৃত্বে মুসলিম কনফারেন্সের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন করছি। আমি আপনাদের নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, মুসলিম লীগ এবং ভারতীয় মুসলমানরা আপনাদের সঙ্গেই থাকবে"। মি. জিন্নাহর এই আহবানে রাজ্যের মুসলিম জনগণ অভূতপূর্ব সাড়া দেন। যার ফলে '৪৭-এর রাজ্যসভা নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য নির্ধারিত একুশটি আসনে মুসলিম কনফারেন্স ১৫টি আসনে জয়লাভ করে। এদিকে শেখ আবদুল্লাহ তাঁর ন্যাশনাল কনফারেন্সের ম্যানিফেস্টোতে রুশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পূর্ণ অনুসরণের কথা ঘোষণা করলে জনগণ তা প্রত্যাখ্যান করেন। বলা যায়, কাশ্মিরে মুসলিম শহিদদের রক্তস্নাত স্বাধীনতা আন্দোলনকে শেখ আব্দুল্লাহ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পথে ধাবমান করেন। '৪৭-এ ভারতের সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার উপমহাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য ভারতে কেবিনেট মিশন প্রেরণ করে। এমতাবস্থায় শেখ আব্দুল্লাহ ইন্ডিয়ান কংগ্রেসের "ভারত ছাড়" আন্দোলনের অনুসরণে "কাশ্মির ছাড়" আন্দোলনের ডাক দেন। ডোগরা শাসনের কঠোর দমননীতির কারণে এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

www.pathagar.com

পাকিস্তানভুক্তির প্রস্তাব

১৯৪৭ সালের ৩ জুন 'ভারত স্বাধীনতা আইন' ঘোষণা করা হয়। ১৮ জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act) পাশ হলে ১৫ অগস্ট পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান নামক দুই নতুন রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের ঘোষণা প্রদান করা হয়। এই অবস্থায় ১৯ জুলাই কাশ্মিরি মুসলিম জনগণের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার মুসলিম কনফারেন্স এক প্রস্তাবের মাধ্যমে কাশ্মির রাজ্যকে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির জোর দাবি জানায়।

মুসলিম কনফারেন্সের এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেস নেতৃত্বের দৃষ্টি কাশ্মিরের দিকে দ্রুত নিবদ্ধ হয়। প্রথমে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ১৯ থেকে ২২ জুন কাশ্মিরে অবস্থান করেন। এবং ১ অগস্ট মহাত্মা গান্ধি শ্রীনগর উপস্থিত হন। বাহ্যত গান্ধিজির শ্রীনগর গমনের ব্যাপারে যদিও কোন বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়নি, তবুও প্রেমনাথের ভাষায়, "গান্ধিজির কাশ্মির আগমনের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নেই বলা হলেও মূলত রাজ্যের সবাই অবহিত ছিল যে, তিনি মহারাজা হরি সিং ও শেখ আবদুল্লাহর ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনের জন্যই কাশ্মির আগমন করেন।" গান্ধিজির কাশ্মির গমনের ফলশ্রুতি হল, রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী রামচন্দ্র কাককে অপসারণ করে বৃদ্ধ ডোগরা জেনারেল জংক সিংকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। এদিকে মি. জিন্নাহ এক বিবৃতিতে কাশ্মিরি জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতেই রাজ্যের ভবিষ্যত নির্ধারণের জোর দাবি জানান। ২৫ জুলাই লর্ড মাউন্ট দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসকদেরকে নয়াদিল্লিতে ভারত বিভাগ পরিকল্পনার ব্যাপারে অবহিত করেন। তিনি শাসকদেরকে প্রস্তাবিত দুই নবরাষ্ট্রের যে কোন একটির সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ দেন। এবং বলেন যে, অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে যেন দুটি মূল বিষয়ে লক্ষ্য রাখা হয়।

১. হিন্দুস্থান (ভারত) বা পাকিস্তানের সঙ্গে ভৌগলিক অবস্থান ও সম্পর্ক।
২. রাজ্যের অধিবাসিদের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা ধর্মীয় সংখ্যাগুরুর ভিত্তিতে অথবা গণরায়ের (রেফারেন্ডাম) মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে।

মাইন্ট ব্যাটেন এই পরামর্শও দেন যে, ১৫ অগস্ট, ১৯৪৭-এর পূর্বেই যেন কোনও না কোনও ফয়সালা করে নেওয়া হয়। সুতরাং ভাইসরয়ের এই বক্তব্যে ভৌগলিক

www.pathagar.com

অবস্থান ও সংখ্যাধিক্য জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাসেই রাজ্যসমূহের ভবিষ্যতের অবস্থা নির্ণয়ের মাপকাঠি নির্ধারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভারত-বিভক্তির দাবিও ছিল দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে। এই দাবির ভিত্তিতেই ভারত-বিভাগ সংঘটিত হয়। এই কারণেই রাজ্যসমূহের অধিবাসিদের ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির সম্পর্ক ছিল অবিতর্কিত ও নীবিড়। কাশ্মির রাজ্যের মোট অধিবাসীর শতকরা সাতাশি ভাগ ছিল মুসলিম আর ভৌগলিক দিক দিয়ে নয়শত পঞ্চাশ কিলোমিটার সীমান্ত পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত। এমনিভাবে কাশ্মির রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি দুই মূলনীতি (অর্থাৎ ভারত-বিভক্তি ও রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্তির মূলনীতি) অনুসারে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হওয়াই ছিল অবশ্যম্ভাবী ও যুক্তিযুক্ত। সুতরাং ১৪ অগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত-বিভক্তির ঘোষণা হয় এবং পাকিস্তান ও হিন্দুস্থান নামের দুই নবরাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হলে সমগ্র কাশ্মির উপত্যকার জনগণ উচ্ছ্বাস, আলোকসজ্জা ও পাকিস্তানি পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। এমতাবস্থায় মহারাজা হরি সিং ও পাকিস্তানের মধ্যে 'স্থিতাবস্থা বহাল চুক্তি' (Stand still Agreement) সম্পাদিত হয়।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক আইন ও অমানবিক সংযুক্তি চুক্তি

স্থিতাবস্থা চুক্তি মোতাবেক ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের যে সকল চুক্তি ব্যবস্থা ছিল, বিস্তারিত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তা পাকিস্তানের সঙ্গে বহাল রাখা হয়। রাজ্য সরকার এই ধরনের চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য ভারত সরকারের কাছেও প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ভারত সরকার তার কোনও জবাব তো দেয়নি, পাকিস্তানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার বিষয়েও কোনও প্রকার বিরোধিতা করেনি। বরং একে সমর্থন করেছে। এই চুক্তি পাকিস্তানকে সেই অধিকার ও ক্ষমতা অর্পণ করে, যা রাজ্যের ওপর ব্রিটিশ সরকারের ছিল। আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক না হরি সিং এই চুক্তির বরখেলাপ করতে পারে আর না ভারত সরকার এর ওপর হস্তক্ষেপ করার আইনানুগ কোন ক্ষমতা রাখে। তথাপি এক পূর্ব-পরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ডোগরা শাসক রাজ্যের মুসলিম জনবসতির ওপর আক্রমণ-অত্যাচার শুরু করে দেন। জম্মু, রাজুরি, পুঞ্চ, রামনগর, উদামপুর ইত্যাদি এলাকায় ডোগরা, জনসংঘ ও আকালি দলের লোকেরা হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। শত শত মহিলার সম্ভ্রম লুণ্ঠন করে। এসব বিভৎস কর্মকাণ্ড ও বর্বরতম অত্যাচারে জনগণ ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে। এদিকে পাকিস্তান ও ভারতের হাতে ব্রিটিশ ভারতের ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে মহারাজা হরি সিং বিশ্বস্ত ব্যক্তি ব্রিগেডিয়ার ঘাঞ্চারা সিংকে গিলগিতের গবর্নর নিয়োগ করেন। ইতোমধ্যে কর্নেল হাসান খানের নেতৃত্বে তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ডোগরা শাহির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে গবর্নরকে গ্রেপ্তার করেন এবং গিলগিত এলাকাকে ডোগরা শাসনমুক্ত করে নেন। এমনিভাবে আরেক বিদ্রোহে ব্রিগেডিয়ার আসলাম খানের নেতৃত্বে বলতিস্তান এলাকাও দখল করে নেয়া হয়। সমস্ত উপত্যকায় সশস্ত্র জনগণ ও সাবেক সামরিকবাহিনীর সদস্যদের যৌথ প্রচেষ্টায় ব্যাপক বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। অল্প সময়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্যও অর্জিত হয়। এবং ২৪ অক্টোবর আজাদ জম্মু ও কাশ্মির রাষ্ট্রের ঘোষণা প্রদান করা হয়। মুজাফফরাবাদ, মীরপুর, কোটলি ও রাওলাকোট এলাকা এই আজাদ রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়। সরদার মোহাম্মদ ইব্রাহিম খানকে এর প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করে ডোগরা শাসনের বিরুদ্ধে তুমুল

www.pathagar.com

যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়; এই যুদ্ধের পদধ্বনি শ্রীনগর পর্যন্ত পৌঁছে যায়। একদিকে উপজাতীয় মুজাহিদ ও বিদ্রোহীরা কামিয়াব ও চূড়ান্ত যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন, অন্যদিকে ২৫ অক্টোবর ডোগরা মহারাজ হরি সিং ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় রাজধানী শ্রীনগর ত্যাগ করে প্রথমে জম্মু ও পরে বোম্বে পলায়ন করেন। হরি সিং পলায়নের পূর্ব মুহূর্তে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, তদানিন্তন ভারতের ইংরেজ গবর্নর লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ও হরি সিং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে অস্থায়ী অন্তর্ভুক্তির ঘোষণা প্রদান করেন। একই সঙ্গে শেখ আব্দুল্লাহকেও মুক্তি দেওয়া হয়। যিনি তখন 'কাশ্মির ছাড়' আন্দোলনের কারণে কারাগারে বন্দি ছিলেন। মুক্তি দেওয়ার পরপরই তাঁকে রাজ্যের প্রধান প্রশাসক নিয়োগেরও ঘোষণা প্রদান করা হয়। শেখ আবদুল্লাহ প্রধান প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণের পর ব্রিটিশ সরকার, মহারাজ হরি সিং ও রাজবংশের অনুগত থাকার শপথ বাক্য পাঠ করেন। এবং মুসলিম কনফারেন্স ও মুজাহিদদের শায়েস্তা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এদিকে ভারত সরকার মহারাজার অস্থায়ী ভারতভুক্তিকে গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে ২৭ অক্টোবর শ্রীনগরে সামরিক বাহিনীর অবতরণ আরম্ভ করে দেয়। মুসলিম মুজাহিদরা এতদিন যে যুদ্ধে ডোগরা ফৌজের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছিল, এখন থেকে সেই যুদ্ধ সংঘটিত হতে থাকল ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে। মুজাহিদ ও উপজাতীয় বাহিনীর হাতে দেশীয় কার্তুজ, বন্দুক ও হিন্দুস্থানি ফৌজ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্র ছাড়া অন্য কোনও কিছু ছিল না। বলা বাহুল্য, এমতাবস্থায় আধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত সরকারি বাহিনীর সঙ্গে দেশীয় তৈরি বন্দুক দিয়ে দীর্ঘ সময় মোকাবেলায় টিকে থাকা ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবুও জিহাদি প্রেরণা ও স্বাধীনতার চেতনায় উজ্জীবিত মুসলিম মুজাহিদরা ভারতীয় বাহিনীকে দৃঢ়ভাবে মোকাবেলা করেন। এবং গোটা কাশ্মিরের এক তৃতীয়াংশ ভারতীয় কবজা থেকে আজাদ করে নেন। এমনিভাবে কাশ্মিরি জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধে একের পর এক সফলতায় ভারত সরকার উপলব্ধি করতে পারে যে, এভাবে যদি জিহাদি চেতনায় ভাস্বর জনগোষ্ঠির অগ্রগতি চলতে থাকে, তাহলে রাজ্যের বাকি অংশও অতিসত্বর হাতছাড়া হয়ে পড়বে। প্রখ্যাত ব্রিটিশ লেখক লর্ড বরডোর্চ এর মতে, "সাতচল্লিশের ডিসেম্বরে কাশ্মির রাজ্যে ভারতীয় সামরিকবাহিনী কঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সুতরাং সম্ভাব্য পরিণতি অনুধাবন করেই ভারত সরকার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়"।

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সাতচল্লিশের ভারত বিভাগ ও তার ভিত্তি কী হওয়া উচিত ছিল. তা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক থাকলেও এই কথা স্পষ্ট যে, দ্বিজাতি-তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করেই ভারত বিভাগ সংঘটিত হয়। এই ফরমুলা মতে দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা পাকিস্তানের সঙ্গে এবং অমুসলিম সংখ্যাধিক্য এলাকা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবে। একই নীতি উপমহাদেশের পাঁচশ'র মত দেশীয় রাজ্যের ব্যাপারেও নির্ধারিত হয়। এই মূলনীতি ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম লীগ যেমন দাবি করেছিল, তেমন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসও স্বীকার করে নেয়। দেশীয় রাজ্যসমূহের শাসকরাও এটি স্বীকার করেন। সুতরাং উপমহাদেশে পাকিস্তান ও ভারত নামের দুই নবরাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর এই

www.pathagar.com

সমস্ত দেশীয় রাজ্য নির্ধারিত নীতি মোতাবেক ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। কোনও রাজ্য যদি এই মীমাংসিত নীতির ব্যতিক্রম করার চেষ্টা করে, তাহলে তা অগ্রাহ্য হয়। যেমন হায়দরাবাদ ও জুনাগড় রাজ্যের মুসলিম শাসকরা যখন পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে সংযুক্তির চেষ্টা করে, তখন ভারতীয় শাসকরা তা ভারত বিভাগের নীতিবিরুদ্ধ বলে প্রত্যাখ্যান করেন। এবং হিন্দুগরিষ্ঠ রাজ্য হিসাবে সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ করে হায়দরাবাদ ও জুনাগড়কে ভারতের সঙ্গে শামিল করে নেন। কিন্তু আশ্চর্য ও দুঃখজনক ব্যাপার হল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের বেলায় ভারতের এই স্বীকৃত নীতির ব্যতিক্রম হয়ে যায়। এবং এখানকার হিন্দু শাসক যখন ভারত বিভাগ নীতির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করে রাজ্যের ভারতভুক্তির ঘোষণা করেন, সঙ্গে সঙ্গেই ভারত সরকার তা গ্রহণ করে নেয় এবং ২৭ অক্টোবর কাশ্মির রাজ্য সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দখল করে নেয়। মহারাজার বেআইনি ভারতভুক্তির আবেদন ছাড়াও ভারত সরকারের একথাও জানা ছিল যে, ১৯ জুলাই, ১৯৪৭-এ কাশ্মিরি জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন মুসলিম কনফারেন্স সর্বসম্মতিক্রমেই পাকিস্তানভুক্তির জোর দাবি জানিয়েছিল। উপরন্তু কাশ্মিরি শাসকের সঙ্গে পাকিস্তানের স্থিতাবস্থা চুক্তি (Stand still Agreement) একতরফাভাবে ভঙ্গ করার আইনত কোন অধিকারও মহারাজা হরি সিং-এর ছিল না। এই চুক্তি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় হরি সিং-এর ভারতভুক্তির আবেদন গ্রহণ করে তারই ভিত্তিতে রাজ্যে সামরিক হস্তক্ষেপ করার কোন অবকাশ ভারত সরকারের ছিল না, ছিল না কোন আইনগত ভিত্তি।

www.pathagar.com

বিশ্ব-জনমতের কাছে ভারতের প্রতিশ্রুতি

কাশ্মিরের ভারতভুক্তির এই নাটক যে সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অবৈধ ছিল, সে সম্পর্কে স্বয়ং ভারতীয় নেতৃবৃন্দ অবহিত ছিলেন। তাই জবর দখলকে পাশ কাটানোর জন্য চুক্তির দলিলপত্র গ্রহণের স্বীকারপত্রে ভারতের তৎকালীন গবর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বলেন, "কোনও রাজ্য-সংযুক্তির প্রশ্ন যদি বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে প্রশ্নটি সে রাজ্যের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে মীমাংসিত হওয়া উচিত। আমার সরকারের ইচ্ছা এই যে, কাশ্মিরে আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার হলে রাজ্যটির সংযুক্তির বিষয় জনগণের মতামত নিয়েই মীমাংসিত হবে।"(মহারাজা হরি সিংকে মাউন্ট ব্যাটেন, ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৭)।

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক টেলিগ্রাম-বার্তায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেন, "এটি আমি স্পষ্ট করতে চাই যে, এ সংকটাবস্থায় কাশ্মিরকে সাহায্য করার ব্যাপারটি কোনভাবেই রাজ্যটিকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হতে প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত হয়নি। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি, যা আমরা বারবার প্রকাশ্যে বলে আসছি, তা হল, কোন বিতর্কিত অঞ্চল বা রাজ্যের সংযুক্তির প্রশ্নটি অবশ্যই সেখানকার জনগণের ইচ্ছানুযায়ী মীমাংসিত হবে এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা অটল।"(টেলিগ্রাম নং: ৪০২, তারিখ: ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৭। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর কাছেও এটি টেলিগ্রাম করা হয়।)

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে অন্য এক টেলিগ্রামে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "ভারতের সঙ্গে কাশ্মিরের সংযুক্তির বিষয়টি আমরা গ্রহণ করেছিলাম মহারাজার সরকার এবং রাজ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়, প্রতিনিধিত্বশীল মুসলিম প্রভাবাধীন সংগঠনটির (শেখ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বাধীন জম্মু এণ্ড কাশ্মির ন্যাশনাল কনফারেন্স) অনুরোধে। তখনও এ শর্তে এটি গৃহীত হয় যে, যখন আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার হবে, তখন সংযুক্তির বিষয়টি কাশ্মিরের জনগণই মীমাংসা করবে। যে কোনও অঞ্চলের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবার পথ খোলা থাকবে তাদের জন্য।"(টেলিগ্রাম নং: ২৫৫, তারিখ: ৩১ অক্টোবর, ১৯৪৭)

জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "কাশ্মিরের জনগণকে তাদের মতামত ব্যক্ত করার পূর্ণাঙ্গ সুযোগ দেওয়া ছাড়া এ রকম সংকটপূর্ণ মুহূর্তে আমরা কোনও কিছু চূড়ান্ত না করতেই আগ্রহী। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে তারাই।

"আমি এটা পরিষ্কার করতে চাই যে, আমাদের পলিসি হল, একটি রাজ্য কোন অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, তা নিয়ে যদি বিতর্ক হয়, সংযুক্তিটা অবশ্যই রাজ্যের জনমত দ্বারা সম্পন্ন হবে। কাশ্মিরের সংযুক্তির দলিলের একটি শর্তে আমরা এই পলিসির কথা যোগ করেছি।"(অল ইন্ডিয়া রেডিও: ২ নবেম্বর, ১৯৪৭)

জাতির উদ্দেশে অপর বেতার ভাষণে নেহেরু বলেন, "আমরা ঘোষণা করেছি যে, কাশ্মিরের ভাগ্য চূড়ান্তভাবে সেখানকার জনগণ দ্বারাই নির্ধারিত হবে। এ প্রতিশ্রুতি শুধু কাশ্মিরের জনগণকে আমরা দেইনি, সারা বিশ্বের কাছে আমাদের এই অঙ্গিকার।

www.pathagar.com

আমরা কিছুতেই তা লঙ্ঘন করতে পারি না।"(অল ইন্ডিয়া রেডিও: ৩ নবেম্বর, ১৯৪৭)

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর কাছে এক চিঠিতে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "যখনই শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে, কাশ্মিরের সংযুক্তির বিষয়টি জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধানে গণভোট দ্বারাই মীমাংসিত হবে।"(চিঠি নং: ৩৬৮, তারিখ: ২১ নবেম্বর. ১৯৪৭)

১৯৪৭-এর ২৫ নবেম্বর বিধানসভায় (ইন্ডিয়ান কনস্টিট্যুআনট এসেম্বলি) এক ভাষণে নেহেরু বলেন, "আমরা আমাদের মহৎ উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তাব রেখেছি যে, জনগণকে যখন তাদের ভবিষ্যত নির্ধারণের সুযোগ দেওয়া হবে, তা হবে জাতিসংঘের মতো নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের তত্ত্বাবধানে। কাশ্মিরের বিষয়টি হল, সন্ত্রাস আর নগ্নশক্তিই কি তাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে নাকি জনগণের মতামত।"

বিধানসভায় ভাষণদানকালে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, এমনকি সংযুক্তির সময় দেয়া ঘোষণায় আমরা বলেছিলাম, গণভোটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাশ্মিরি জনগণের মতামতকে আমরা মেনে চলব। পরবর্তীতে আমরা বিষয়টার প্রতি জোর দিয়েছিলাম যে, কাশ্মির সরকারকে অবশ্যই শিগগির একটি জনপ্রিয় সরকারে রূপ নিতে হবে। আমরা এ অবস্থানে পুরোপুরি অটল থেকেছি এবং সব ধরনের নিরাপত্তা বিধান করে সুষ্ঠু গণভোট সম্পন্ন করে তাদের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে আমরা প্রস্তুত রয়েছি।"(৫ মার্চ, ১৯৪৮)

লন্ডনে সংবাদ সম্মেলনে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "কাশ্মিরের জনগণকে তাদের মতামত ব্যক্ত করার ক্ষমতা প্রদান করতে যথাযথ নিরাপত্তা বিধানে জাতিসংঘের সঙ্গে কাজ করতে ভারত বারবার প্রস্তাব রেখেছে। এবং আমরা তা করতে বরাবরই প্রস্তুত। শুরু থেকে আমরা কাশ্মিরের জনগণের ভাগ্য গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হবার ধারণাই পোষণ করে এসেছি। বাস্তবিকপক্ষে, জাতিসংঘ এ ব্যাপারে সমক্ষে আসার অনেক আগ থেকেই এটি আমাদের প্রস্তাব ছিল। প্রথমত, চূড়ান্ত ফয়সালা, যা অবশ্যই হতে হবে, তা মূলত কাশ্মিরের জনগণ দ্বারাই হবে; দ্বিতীয়ত, ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, আমরা (ভারত ও পাকিস্তান) ইতোমধ্যে বড় একটা চুক্তিতে উপনীত হয়েছি। যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি, অনেক মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে আমরা একমত। আমরা সবাই একমত যে, কাশ্মিরের জনগণই নিজেদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ ভবিষ্যত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। এখানে একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে, আমাদের একমত হওয়া ছাড়াও, কাশ্মিরিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাশ্মিরের সঙ্গে কোন দেশ সংযুক্ত হতে যাচ্ছে না। "(১৬ জানুয়ারি, ১৯৫১; দ্য স্টেটম্যান, ১৮ জানুয়ারি, ১৯৫১)

১৯৫১-এর ৬ জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে এক রিপোর্টে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "কাশ্মিরকে অন্যায়ভাবেই ভারত কিংবা পাকিস্তানের প্রতি পুরস্কার হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষ সম্ভবত ভুলে যাচ্ছে যে, কাশ্মির কোন পণ্যদ্রব্য নয়, যা বিক্রি বা আদান-প্রদানযোগ্য। এটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে এবং এর চূড়ান্ত ভাগ্যনিয়ন্তা এর জনগণই। তবে এখন একটি সংগ্রাম সফল হতে চলেছে; শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, মানুষের অন্তরেও।

www.pathagar.com

জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে লেখা এক চিঠিতে পণ্ডিত নেহেরু লিখেছিলেন, "ভারত সরকার ভারতের সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মিরের সংযুক্তিটি জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু গণভোটের মাধ্যমে মীমাংসিত হবে–সে নীতি গ্রহণটাই শুধু ফের নিশ্চিত করছে না, বরং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ ধরনের গণভোটের প্রয়োজনীয় শর্তাবলী প্রণয়নের ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন।" (১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫১)

পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণাধীন এক তৃতীয়াংশ কাশ্মির অঞ্চল নিয়ে কংগ্রেস সরকার কী করতে যাচ্ছে– বিধানসভায় ড. মুখার্জির এ প্রশ্নের জবাবে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "কাশ্মির ভারত বা পাকিস্তান কারো সম্পত্তি নয়। এর মালিক কাশ্মিরের জনগণই। কাশ্মির যখন ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, কাশ্মিরের জননেতাদের কাছে পরিষ্কার করেছিলাম যে, আমরা গণভোটের রায় পুরোপুরি মেনে চলব। যদি তারা আমাদের চলে আসতে বলে, কাশ্মির ত্যাগ করতে আমার দ্বিধা থাকবে না।

"আমরা বিষয়টি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জাতিসংঘে নিয়েছি। আমরা কথা দিয়েছি সিদ্ধান্ত মানব বলে। মহান জাতি হিসাবে সে প্রতিশ্রুতিতো আমরা ভাংতে পারি না। প্রশ্নটির চূড়ান্ত সমাধানের জন্য আমরা কাশ্মিরিদের ওপর ছেড়ে দিয়েছি এবং তাদের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে আমরা বদ্ধপরিকর।" (অমৃতবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ২ জানুয়ারি, ১৯৫২)

ভারতীয় লোকসভায় বিবৃতি দানকালে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "আমি বিষয়টি পরিষ্কার করতে চাই যে, কাশ্মিরিদের আনন্দ ও সদিচ্ছা দ্বারা তাদের ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে– এ মূল প্রস্তাবটি আমরা গ্রহণ করি। পার্লামেন্টের আনন্দ বা সদিচ্ছা এ ব্যাপারে গুরুত্বহীন। এর কারণ এ-ই নয় যে, কাশ্মিরের প্রশ্নটি মীমাংসা করার অধিকার লোকসভার নেই। বরং এর কারণ হচ্ছে, তাদের ওপর কিছু আরোপ করা হবে পার্লামেন্টের নিয়ম-কানুনবিরুদ্ধ।

"কাশ্মির আমাদের হৃদয়ের খুব কাছাকাছি। ভাগ্যের দোষে কিংবা অন্য কোন কারণে এটা যদি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, তা হবে আমাদের জন্য বেশ পীড়াদায়ক। কাশ্মিরিরা যদি আমাদের সঙ্গে থাকতে না চায়, তবে তাদের যেতে দাও। যে রকম পীড়াদায়কই হোক, তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা তাদের রাখতে চাই না।

"আমি জোর দিতে চাই যে, কাশ্মিরিরাই শুধু তাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে পারে। এটি আমরা শুধু কাশ্মিরিদের আর জাতিসংঘকে বলিনি। এটি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় এবং আমাদের অনুসৃত-নীতিমালা এটাকেই সমর্থন করে। এ পাঁচ বছর আমরা অনেক করেছি, আমাদের প্রচুর ব্যয় ও কষ্ট হয়েছে। তবু কাশ্মিরের জনগণ যদি আমাদের সরে আসতে বলে , আমরা স্বেচ্ছায় সরে আসব; সে ছেড়ে আসা যত বেদনারই হোক। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা সেখানে থাকতে চাই না। বেয়নেটের সামনে আমরা নিজেদেরকে তাদের ওপর আরোপ করতে চাই না।" (৭ আগস্ট, ১৯৫২)

৩১ মার্চ, ১৯৫৫-এ লোকসভায় এক বিবৃতিতে পণ্ডিত নেহেরু বলেন, "ভারত পাকিস্তানের মধ্যেকার সমস্যাগুলোর মধ্যে সবচে' জটিল সম্ভবত কাশ্মির-সমস্যা।

www.pathagar.com

যা'হোক, কাশ্মির যখন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেকার সমস্যা, আমাদের এ কথা মনে রাখতে হবে যে, কাশ্মির আমাদের মৌখিক বিষয় হবার বস্তু নয়, বরং এর নিজস্ব আত্মা ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। কাশ্মিরিদের সদিচ্ছা ও সম্মতি ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়।" (হিন্দুস্থান টাইমস, নয়াদিল্লী, ১ এপ্রিল, ১৯৫৫)

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে এক বিবৃতিতে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রী কৃষ্ণ মেনন বলেন, "এ যাবত যে বক্তব্য আমি রেখেছি, তাতে এমন কোন শব্দ নেই, যার অর্থ এ-ই হবে যে, আমরা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাকে সম্মান করব না। রেকর্ডের জন্য আমি বলতে চাই, ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে, তাতে এমন কিছু নেই, যা বিন্দুমাত্র নির্দেশ করবে যে, ভারত সরকার যে কোন আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাকে অসম্মান দেখাবে।" (নিরাপত্তা পরিষদের ৭৬৫ তম সভায় কাশ্মির বিষয়ে বিতর্ক: ২৪ জানুয়ারি, ১৯৫৭)

এই ছিল ভারতের অবিসংবাদিত নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি, যা অর্ধশতাব্দিকাল অবধি পালন করা হয়নি।

www.pathagar.com

জিন্নাহ'র নির্দেশ পালনে ইংরেজ সেনাপ্রধানের অসম্মতি

ডোগরা মহারাজার পলায়ন অবস্থায় বিতর্কিত ভারতভুক্তি এবং ভারতীয় সামরিকবাহিনী নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা বা এই অবৈধ দখল থেকে কাশ্মিরকে মুক্ত করার আইনগত ও নৈতিক অধিকার পাকিস্তানের ছিল। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারত ও পাকিস্তানের যৌথ ইংরেজ সেনাপ্রধান থাকার কারণে তা সম্ভব হয়নি। জম্মু ও কাশ্মিরে ভারতীয় প্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নির্দেশ সত্ত্বেও ইংরেজ সেনাপ্রধান তাঁর নির্দেশ পালনে অসম্মত হন। এবং বাধ্য হয়েই জিন্নাহকে নির্দেশ প্রত্যাহার করতে হয়। কাশ্মিরে ভারতীয় বাহিনী নিয়োগের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর সরাসরি প্রতিরোধ ব্যবস্থা না করা সম্পর্কে জানা যায় যে, কায়দে আজম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে কাশ্মিরে প্রবেশ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু পাকিস্তানের তদানিন্তন সেনাপ্রধান ডগলাস গ্রেসি জিন্নাহর এই নির্দেশ এই বলে অমান্য করেন যে, সুপ্রিম কমান্ডার ফিল্ড মার্শাল ক্লাড ইকনল্ক-এর অনুমতি ছাড়া এ ধরনের কোনও কার্যক্রম সম্ভব নয়। জেনারেল গ্রেসি মি. জিন্নাহর নির্দেশ পালনে অক্ষমতা দেখানোর পর দিল্লিতে সুপ্রিম কমান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং ২৮ অক্টোবর ফিল্ড মার্শাল ক্লাড লাহোরে এসে জিন্নাহ সাহেবকে স্পষ্ট বলে দেন যে, পাকিস্তান যদি তার সেনাবাহিনী কাশ্মিরে ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে নিয়োগ করে, তাহলে পাকিস্তানি সামরিকবাহিনীর ইংরেজ অফিসারদেরকে প্রত্যাহার করা হবে। এই অবস্থায় জিন্নাহ সাহেব তাঁর নির্দেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে আজাদ কাশ্মিরের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও মুসলিম কনফারেন্স নেতা সর্দার মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান বলেন, "এই সময় কায়দে আজম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে শ্রীনগর ও জম্মুতে আক্রমণের নির্দেশ দেন। কিন্তু, (তদানিন্তন) পাকিস্তান মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য একমত না হওয়ার কারণে নির্দেশ বাস্তবায়িত হয়নি। কায়দে আজম অত্যন্ত রাগত স্বরে বলেছেন যে, আমার মন্ত্রিপরিষদের সৎ-সাহসের অভাবে এটা সম্ভব হয়নি।"

www.pathagar.com

জাতিসংঘ ও কাশ্মির

কাশ্মিরি শাসক ডোগরা মহারাজার ভারতভুক্তি এবং ভারতের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কাশ্মিরের সশস্ত্র প্রতিরোধ-যুদ্ধ শুরু হলে সীমান্ত প্রদেশ ও আফগানিস্তানেরও বহু যোদ্ধা এই যুদ্ধে শামিল হন। এমনকি এক পর্যায়ে ১৯৪৮-এর মে মাসের দিকে পাকিস্তানি সৈন্যরাও এতে শামিল হন। এমতাবস্থায় ভারতীয় সৈন্যবাহিনী কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখিন হলে ভারত উপলব্ধি করে যে, যে কোনও মুহূর্তেই তাদের সৈন্যবাহিনী জম্মু ও কাশ্মির ত্যাগে বাধ্য হবে। তাই ভারত সরকার ১ জানুয়ারি ১৯৪৮-এ জাতিসংঘ সনদের ৩৫ ধারার অধীনে নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ উত্থাপন করে। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানও এর জবাবি অভিযোগ দায়ের করে। নিরাপত্তা পরিষদ দীর্ঘ বিতর্ক ও পর্যালোচনার পর এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে তিন সদস্য-বিশিষ্ট একটা কমিশন গঠন করে। এই কমিশন পাক-ভারত জাতিসংঘ কমিশন (UNCIP) নামে খ্যাত। ২১ এপ্রিল নিরাপত্তা পরিষদে বেলজিয়াম, কেনেডা, চিন, কলম্বিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকার উত্থাপিত প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে মঞ্জুর করা হয়। এই প্রস্তাবে কাশ্মির সমস্যা সমাধানে জাতিসংঘের মূলনীতির প্রতিফলন ঘটে। দুই পরিচ্ছদে বিভক্ত এই প্রস্তাবের 'ক' অংশে জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা পুনর্বহাল এবং সৈন্য অপসারনের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়। 'খ' অংশে গণভোট গ্রহণের বিষয় উল্লেখ থাকে। এবং গণভোট পরিচালনাকারীকে রাজ্যের ভোট গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই অংশে ভারতকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণরায় গ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শও প্রদান করা হয়। এরই সঙ্গে UNCIP সদস্য সংখ্যাও তিন থেকে পাঁচ-এ উন্নীত করা হয়। পাক-ভারত জাতিসংঘ কমিশন ১৯৪৮ সালের ১৩ অগস্ট যুদ্ধবিরতি ও রাজ্যের ভবিষ্যত নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতের ঐকমত্যের ওপর ভিত্তি করে বিস্তারিত প্রস্তাব পাশ করে। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারত তার এই প্রতিশ্রুতির পুনর্ব্যক্ত করে যে, কাশ্মিরের ভবিষ্যত নির্ধারণে সেখানকার জনগণই থাকবে সর্বেসর্বা। উক্ত কমিশন '৪৯ এর ৫ জানুয়ারি অপর এক প্রস্তাবে জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের ভারত কিংবা পাকিস্তানভুক্তির বিষয়কে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণরায়ের মাধ্যমেই সমাধা করার কথা পুনর্ব্যক্ত করে।

১৯৫৯ এর ১৭ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি কেনেডার জেনারেল মেকনাটনকে জাতিসংঘের এলসি নিয়োগ করা হয়। মি. মেকনাটন ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর একটা রিপোর্ট প্রদান করেন। এতে বলা হয় যে, উভয় রাষ্ট্র যেন কাশ্মির থেকে নিয়মিত সশস্ত্রবাহিনী ফিরিয়ে নেয় এবং জাতিসংঘ এই প্রত্যাহার-কাজ তত্ত্বাবধান করবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা হয় যে, সৈন্য প্রত্যাহার-কার্য সম্পন্ন হলে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও যাতে জাতিসংঘের প্রতিনিধির নিয়ন্ত্রণেই শুরু হয়। ভারত সরকার বিভিন্ন টাল-বাহানার আড়ালে জেনারেল মেকনাটনের রিপোর্ট বাস্তবায়নে অনীহা প্রকাশ করতে থাকে। ভারত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেও ১৯৫০ সালের ১৪ মার্চ জেনারেল মেকনাটনের পরামর্শকে

www.pathagar.com

নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব আকারে মঞ্জুর করে নেয়। এবং জাতিসংঘ ভারত পাকিস্তান উভয় দেশকে পাঁচ মাসের মধ্যে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করে। নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রস্তাবে ইতোপূর্বে গঠিত পাক-ভারত জাতিসংঘ কমিশন ভেঙ্গে দিয়ে তদস্থলে একজন জাতিসংঘ প্রতিনিধি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। সুতরাং জাতিসংঘের প্রথম প্রতিনিধি হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার একজন বিচারক উভন ডিকশনকে নিয়োগ করা হয়। একই বছরের ১৫ ডিসেম্বর স্যার ডিকশন এক রিপোর্টে নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করেন যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোট অনুষ্ঠানের কোনও প্রকার প্রস্তাবে সম্মত নন। ফলে এখানে গণভোট অনুষ্ঠান সুদূর পরাহত। এই বক্তব্যের পর মি. ডিকশন দায়িত্ব থেকে ইস্তফা প্রদান করেন।

ইতোমধ্যে ২৭ অক্টোবর ১৯৫০-এ শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে অল জম্মু এণ্ড কাশ্মির ন্যাশনাল কনফারেন্স রাজ্যের ভবিষ্যত নির্ধারণের লক্ষ্যে আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠার দাবি জানায়। এবং অচিরেই উপত্যকার ভারতীয় দখলের সমর্থক ন্যাশনাল কংগ্রেসপন্থীদের নিয়ে তথাকথিত একটি আইনসভা (Parleament) প্রতিষ্ঠা করা হয়। '৫১ সনের নবেম্বরে জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের অস্থায়ী ও বিতর্কিত ভারতভুক্তিকে রাজ্যের মনোনীত এই আইনসভার মাধ্যমে অনুমোদন করা হয়। এদিকে জাতিসংঘ তার প্রতিনিধি ডিকশনের পদত্যাগের পর তদস্থলে আমেরিকার ডা. গ্রাহামকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে। ৫১ সালের ৩০ মার্চ ডিকশন প্রদত্ত রিপোর্টের ওপর বিস্তারিত পর্যালোচনার পর নিরাপত্তা পরিষদ পুনরায় আরেক প্রস্তাবে পাক-ভারতের পূর্ব-প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একই প্রস্তাবে ন্যাশনাল কনফারেন্স কর্তৃক ২৭ নবেম্বর '৫০-এর আইনসভা প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কিংবা এই ধরনের কোনও এসেমব্লি কর্তৃক অনুমোদিত সিদ্ধান্ত, জাতিসংঘের ২১ এপ্রিল '৪৮, ৩ জুন '৪৮ ও ১৪ মার্চ '৫০-এর প্রস্তাবাবলী এবং পাক-ভারত জাতিসংঘ কমিশনের ১৩ অগস্ট '৪৮ ও ৫ জানুয়ারি '৪৯ এর প্রস্তাবাবলীর ওপর কোন প্রকার প্রভাব ফেলবে না বলে দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোটের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের ওপর জোর দেওয়ার কথাও পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

জাতিসংঘ প্রতিনিধি ডক্টর গ্রাহাম সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়ে একাধিকবার ভিন্ন ভিন্ন বিকল্প প্রস্তাব পেশ করলেও ভারত প্রত্যেকবারই অনীহা প্রকাশ করে। মি. গ্রাহাম এই প্রস্তাবও দেন যে, পাকিস্তান আজাদ কাশ্মিরে চার হাজার সৈন্য রেখে বাকি সৈন্য যেন প্রত্যাহার করে নেয় আর ভারত তার অধিকৃত এলাকায় ষোল হাজার সৈন্য ছাড়া বাকি সৈন্য যেন প্রত্যাহার করে নেয়। ভারত এ পর্যায়ে ষোল হাজারের পরিবর্তে আটাশ হাজার সৈন্য কাশ্মিরে রাখার দাবি পেশ করে। নিরাপত্তা পরিষদের ৫ নবেম্বরের অধিবেশনে পাকিস্তানি প্রতিনিধি নাটকীয়ভাবে মি. গ্রাহামের সৈন্য প্রত্যাহার সম্পর্কিত প্রস্তাব মেনে নেওয়ার ঘোষণা দেন। সঙ্গে সঙ্গেই ভারত তার দাবিকৃত সৈন্য সংখ্যার ওপরও দৃঢ় না থেকে এ প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। এবং ভারতীয় প্রতিনিধি বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত উল্টো পাকিস্তানকেই আজাদ কাশ্মির এলাকা ও উত্তর এলাকা খালি করে দেওয়ার দাবি করে বসেন। এমতাবস্থায় ২৩ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ ড. গ্রাহামের প্রস্তাব অনুমোদন করে এবং ইতোপূর্বে পাশকৃত সকল প্রস্তাবাবলীর কথা

www.pathagar.com

পুনরুল্লেখ করে। জাতিসংঘ-প্রস্তাব বাস্তবায়নে ভারতের অব্যাহত অনীহার প্রতি ইঙ্গিত করে মি. গ্রাহাম ভারত ও পাকিস্তানকে সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দিক নির্দেশনা গ্রহণেরও আবেদন করেন। এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০ অগস্ট দিল্লিতে নেহেরু-মোহাম্মদ আলী আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকও উষ্ণ ভাষার প্রতিশ্রুতির পুনর্ব্যক্তকরণ ছাড়া সমস্যা সমাধানের কোনও দিক-নির্দেশনা গ্রহণে ব্যর্থ হয়।

১৯৫৭ সালের ২৫ জানুয়ারি পাকিস্তানের আবেদনক্রমে কাশ্মির সমস্যার ওপর আলোচনার নিমিত্তে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহবান করা হয়। পাকিস্তানি প্রতিনিধি ফিরোজ খান নুন জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যে ভারত ও পাকিস্তানি সৈন্যের পরিবর্তে জাতিসংঘের শান্তি-সেনা নিয়োগের আবেদন এবং জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠানের দাবি করেন। নিরাপত্তা পরিষদের এই বৈঠকে ভারত প্রথমবারের মত এই বলে জম্মু ও কাশ্মিরকে ভারতের অংশ হিসাবে দাবি করে যে, রাজ্যের আইনসভা কাশ্মিরের ভারতভুক্তিকে অনুমোদন করে নিয়েছে। পুনরায় '৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদের অপর সভা কাশ্মির সমস্যার ওপর বিস্তারিত আলোচনার পর ইতোপূর্বে পাশ করা সকল প্রস্তাব পুনঃঅনুমোদন দান করে। এই বৈঠকে পরিষদ এ-ও স্পষ্ট করে দেয় যে, ন্যাশনাল কনফারেন্সের আইনসভায় কাশ্মিরের ভারতভুক্তির অনুমোদন কোনও অবস্থাতেই জাতিসংঘ প্রস্তাবাবলীকে প্রভাবিত করতে পারবে না। জাতিসংঘের প্রস্তাব অকার্যকর করার কিংবা কাশ্মিরের ভবিষ্যত নির্ধারণে এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার এই মনোনীত পার্লামেন্টের নেই। ৩০ জানুয়ারি নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক দ্বিতীয়বার শুরু হয়। এই বৈঠকে অস্ট্রেলিয়া, কিউবা, ব্রিটেন ও আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এই প্রস্তাবে কাশ্মির রাজ্যে জাতিসংঘের শান্তি-সেনা নিয়োগের পাকিস্তানি প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন প্রদান করা হয়। কিন্তু, দুঃখজনকভাবে পরিষদের এই সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ওপর সোভিয়েত রাশিয়ার ভেটো প্রদানের ফলে তা অকার্যকর হয়ে যায়। ২৪ সেপ্টেম্বর সোভিয়েত-ভেটোর ফলে উদ্ভূত সমস্যার ওপর আলোচনার লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদ পুনরায় বৈঠকে মিলিত হয়। এই বৈঠকে পাকিস্তান একতরফাভাবে আজাদ কাশ্মিরে জাতিসংঘের সৈন্য নিয়োগের আবেদন পেশ করে। নাটকীয়ভাবে পাকিস্তানের একতরফা এই প্রস্তাবের ফলে জম্মু ও কাশ্মির রাজ্য থেকে ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী প্রত্যাহারের পথে আর কোনও বাধা থাকে না, থাকে না কোনও প্রকার টাল-বাহানা। কিন্তু পরিষদে ভারতের প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেনন এই প্রস্তাবও মানতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, এই প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তান ভারতের নিজের এলাকায় নিজ সৈন্যের পরিবর্তে ভিন্ন সশস্ত্রবাহিনী মোতায়েনের চেষ্টা করছে। এমতাবস্থায় ২ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ আরেকবার জাতিসংঘ কমিশন ও পরিষদের অতীতের প্রস্তাবসমূহের কার্যকারিতার ওপর জোর দিয়ে ড. গ্রাহামকে একটা মীমাংসায় আনার পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করে।

১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের আবেদনক্রমে পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের

www.pathagar.com

বৈঠক আহবান করা হয়। এই বৈঠকে আয়ারল্যান্ডের উত্থাপিত প্রস্তাবের ওপর রাশিয়া পুনরায় ভেটো প্রদান করে। একই বছরের ডিসেম্বরে আমেরিকা ও পাশ্চাত্যের কিছু দেশের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় পাক-ভারত মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনা বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়।

এই প্রেক্ষিতে পাক-ভারত প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রিদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ভুট্টো-চরণ সিং বৈঠক নামে খ্যাত এই বৈঠকও কাশ্মির সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথ নির্দেশনায় ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

'৪৭-এর সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ: একটি পর্যালোচনা

১৯৪৭ সাল ছিল কাশ্মির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম সশস্ত্র প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় ছিল যথেষ্ট ভুল-ভ্রান্তি। অদূরদর্শিতা, সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব ও সিদ্ধান্তহীনতা যেমন ছিল, তেমনি অসংগঠিত ছিল এই প্রচেষ্টা। সর্বোপরি দীর্ঘদিনের সংগ্রামী নেতা শেখ আবদুল্লাহর ভারতপ্রীতি ও ক্ষমতালিপ্সার কারণে এ পর্যায়ের সশস্ত্র প্রচেষ্টা কামিয়াবির দ্বারপ্রান্তে এসেও অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই সম্পর্কে মেজর জেনারেল আকবর খান তাঁর Raiders in Kashmir নামক বইতে স্পষ্ট করে বলেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ অক্টোবর কাশ্মিরে ভারতীয় সামরিক কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে জড়িত মি. এল.পি. সেন স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, "পাকিস্তানের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য হল, উপজাতীয় লোকদেরকে যুদ্ধের জন্য কাশ্মিরে পাঠানো। উপজাতীয় আক্রমণের তড়িৎ ফলাফল এই হল যে, মহারাজা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কালবিলম্ব না করেই ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির ঘোষণা প্রদান করে। এছাড়া এই আক্রমণ জম্মুর দিকে না করে মোজাফফরাবাদে করাও ছিল এক মহা ভুল। মোজাফফরাবাদে আক্রমণ করার অর্থ হল, ভারতের টুটি চেপে ধরার পরিবর্তে তার লেজেই পা দিয়ে রাখা।" এ ব্যাপারে কথিত আছে যে, কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহও পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীকে জম্মুতে আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে নির্দেশ কার্যকর হয়নি।

কাশ্মিরের ভারতভুক্তি ঘোষণার পরপরই পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খান ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপে উদ্ভুত পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য এক আলোচনা সভা ডাকেন। এতে কর্নেল ইসকান্দর মির্জা (প্রতিরক্ষা সচিব ও পরে পাকিস্তানের গবর্নর জেনারেল), চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (তখনকার প্রধান সচিব ও পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী), খান আবদুল কাইয়ুম খান (সীমান্ত প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী), নওয়াব মামদুট (পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী) এবং মেজর জেনারেল আকবর খান উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত আলোচনা সভায় জেনারেল আকবর খান প্রস্তাব করেন যে, মোজাফফরাবাদের পরিবর্তে উপজাতীয়দের সমন্বয়ে গঠিত সশস্ত্র দল যেন জম্মুর দিকেই আক্রমণ করে, যাতে ভারতীয় বাহিনীর কাশ্মির প্রবেশের এবং গোটা উপত্যকায় সামরিক রসদ সরবরাহের একমাত্র পথ বন্ধ হয়ে যায়। এই কাজে জেনারেল আকবর নিজেই নেতৃত্ব দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের দৃষ্টিকোণ থেকে জম্মু ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জম্মু ছাড়া ভারতীয় সেনাদলের স্থল পথে কাশ্মির পৌঁছার বিকল্প কোনও পথ ছিল না। এই পথ দিয়েই ভারত কাশ্মিরের নোশেরাহ্, রাজুরি, পুঞ্চ ইত্যাদি জেলায় স্বাধীনতাকামীদের পথে কঠোর বাধার সৃষ্টি করত এবং ভারতীয় সেনাদলের যাবতীয় রসদ সরবরাহ ও অন্যান্য যোগাযোগ স্থাপন করত।

www.pathagar.com

জেনারেল আকবরের ভাষায় জম্মুকে খোলা রেখে কাশ্মিরে যুদ্ধ করার অর্থ 'অভ্যন্তর ভাগে নদি-বহমান একটা দীঘির পানি ক্ষুদ্র পাত্রের সাহায্যে নিঃসরণ করার ব্যর্থ প্রয়াস' ছাড়া আর কিছুই নয়। ভারতীয় বাহিনীর যাতায়াত-যোগাযোগ বন্ধ করে দেওয়ার এই উত্তম সুযোগ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যরা গ্রহণ করেননি। এই প্রস্তাব গ্রহণ না করার কারণ ছিল একমাত্র পাকিস্তানের ওপর ভারতীয় আক্রমণের ভয়।

তাঁরা মনে করতেন, এই প্রস্তাব কার্যকর হলে ভারত অচিরেই পাকিস্তানের ওপর হামলা করে বসবে। প্রকৃতপক্ষে সেই সময় পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করার মত অবস্থা ভারতের ছিল না। কেননা একদিকে যেমন ভারতের সেনাবাহিনী তখন অভ্যন্তরীণ নানা সমস্যার মোকাবেলা করছিল, তেমনি উপজাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধারা কাশ্মিরের আশি ভাগ অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। উপরন্তু তখন ছিল সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠিত করার কাজে ব্যস্ততা। তাছাড়া উপজাতীয় বিদ্রোহ পশ্চিম পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার বিস্তর সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। উপজাতীয়রা পাকিস্তানের এলাকা হয়েই মিরপুর, পুঞ্চ, নোশেরাহ ইত্যাদি এলাকা অবরোধ করে রাখলে এই অভিযোগে ভারতের পাকিস্তান আক্রমণ করার বাহানা থাকলেও তা করেনি। এমন কী, এর মাত্র কিছুদিন পর পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন কাশ্মিরে ভারতীয় সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখনও ভারত পাকিস্তানে আক্রমণ করেনি। তাছাড়া এর ফলে যদি পাক-ভারত যুদ্ধ লেগেও যেত, তাহলেও পাকিস্তানের হারানোর কিছু ছিল না। যে পাকিস্তান পরবর্তী পর্যায়ে পাঁচগুণ বেশি সামরিক শক্তির অধিকারী ভারতের সঙ্গে মোকাবেলা করেছে, তখন মাত্র দ্বিগুণ শক্তির মোকাবেলা করা তেমন ভয়ের কারণ ছিল না। উপরন্তু তখন হাজার হাজার কাশ্মিরি স্বাধীনতাযোদ্ধার সহযোগিতাও সহজ ছিল। তখন ভারতের সকল সৈন্যকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগ হাতে ছিল না। কারণ তখন হায়দরাবাদেও ভারতীয় সেনাবাহিনীকে মোতায়েন থাকতে হত। আর যদি ভারত পূর্ব-পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) আক্রমণ করত, তাহলে তাকে অবশ্যই কাশ্মির ছাড়তে হত।

এদিকে ভারত জুনাগড়ের বিরুদ্ধেও আক্রমণকারীর ভূমিকা নেয়। অথচ এই রাজ্য আইনগতভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। জুনাগড়ের ব্যাপারে হিন্দুস্থান যে ভূমিকা পালন করেছে, একই ভূমিকা যদি একই কারণে পাকিস্তান কাশ্মিরের ব্যাপারে পালন করত, তাহলে জাতিসংঘ কিংবা বিশ্ব জনমতের পক্ষে ভারতের পক্ষাবলম্বন সম্ভব ছিল না। মি. লেয়াকত আলী খানের কাছে যখন জেনারেল আকবর খান জিজ্ঞাসা করেন, "আমাদের সামরিক উদ্দেশ্য কী?" উত্তরে প্রধানমন্ত্রী লোয়াকত আলী খান বলেন, "আমি চাই যুদ্ধ তিন মাস পর্যন্ত চলতে থাকুক। এরই মধ্যে আমরা আলাপ-আলোচনা কিংবা অন্য কোন উপায়ে আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলে সক্ষম হব।" পাকিস্তানের প্রায় সব ক'টি সরকারই মূলত কাশ্মির সমস্যার স্থায়ী সমাধানের ব্যাপারে আন্তরিক ও সাহসিকতাপূর্ণ ভূমিকা পালনের পরিবর্তে সে-দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারে এটাকে অধিক পরিমাণে ব্যবহার করেছে। এমন কী বিষয়টিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে ব্যবহার করতেও কসুর করেনি।

www.pathagar.com

লেয়াকত-ইব্রাহিম আলোচনায় নেপথ্যের ঘটনা

১৯৯১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তানের ইসলামাবাদস্থ Institute of Policy Studies-এর এক সেমিনারে কাশ্মির স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা ও আজাদ কাশ্মিরের প্রথম ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট এবং অল জম্মু এণ্ড কাশ্মির মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি সরদার ইব্রাহিম খান অত্যন্ত রহস্যজনক একটা ঘটনার বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, "৪৮ সালে কাশ্মিরে যুদ্ধ বন্ধ ঘোষণার পূর্বে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খান একদিন আমাকে ডেকে বলেন, 'ভারতের প্রভাবশালী নেতা সরদার বল্লভ ভাই পেটেল প্রস্তাব করেছেন, পাকিস্তান যেন কাশ্মির নিয়ে নেয় আর হায়দরাবাদ (দক্ষিণ) ভারতকে দিয়ে দেয়। মি. পেটেলের মতে এটাই বর্তমান অবস্থার দাবি। এই প্রস্তাবে তোমার মতামত কী?' আমি সঙ্গে সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রীকে উত্তম প্রস্তাব মেনে নেওয়ার পক্ষে মতামত প্রদান করি। কিন্তু আমার মনে হল, লেয়াকত আলী খানের পক্ষে এই প্রস্তাব মেনে নেওয়া অসাধ্য ছিল। সুতরাং তিনি আমাকে এই ব্যাপারে পাকিস্তানের তদানিন্তন অর্থমন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে সাক্ষাত করে এই প্রস্তাবের পক্ষে তাঁর মত নেওয়ার কথা বলেন। মি. লেয়াকত আলী খান নিজেই গোলাম মোহাম্মদের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেন। গোলাম মোহাম্মদকে আমি এই প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করি। উত্তরে গোলাম মোহাম্মদ বলেন, 'তুমি কি জান, আমি গোটা হিন্দুস্থানকেই উথাল-পাতাল করে ছাড়ব।' এ কথা শুনে আমি নীরবে তার কক্ষ ত্যাগ করি। প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খানের প্রধান সচিব নওয়াব সিদ্দিক আলী খানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও মি. গোলাম মোহাম্মদকে এই কথা মানাতে পারেননি।"

সরদার ইব্রাহিম খান আরো বলেন, আপনারা পর্দার অন্তরালের আসল কথা শুনে অবাক হবেন যে, সিডনি কাটন নামের এক ব্যক্তি হায়দরাবাদ ও করাচির মধ্যে স্বর্ণের ইট নিয়ে আসত। করাচিতে হায়দরাবাদের এজেন্ট জেনারেল মোশতাক আহমদ খান আমাকে বলেন যে, "এই স্বর্ণের অর্ধেক অংশ আমরা পেতাম; বাকি অংশ গোলাম মোহাম্মদ নিয়ে যেতেন"। সুতরাং সেই হায়দরাবাদের বিনিময়ে কাশ্মির নেওয়া কি গোলাম মোহাম্মদের পক্ষে সম্ভব ছিল?

www.pathagar.com

যদি এমন হত: কর্নেল আব্বাসির ভিন্নমত

কাশ্মিরি মুসলিম জনগোষ্ঠি বিপুল ত্যাগ ও কোরবানির বিনিময়ে বর্তমান আজাদ এলাকা, গিলগিত ও বলতিস্তান মুক্ত করে সেখানে স্বাধীন একটা সরকার প্রতিষ্ঠা করে। এই সরকার নিতান্ত সহায়-সম্বলহীন অবস্থায়ও ভারতীয় সৈন্যকে একাধিক ক্ষেত্রে পিছু হঠতে বাধ্য করেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থা বেগতিক দেখে ভারত জাতিসংঘের আশ্রয় নেয় এবং ১ জানুয়ারি, ১৯৪৯-এ যুদ্ধবিরতি স্থাপনে কামিয়াব হয়। অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হয় যে, পাকিস্তানি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অপরিপক্কতার কারণে ভারত একটা পরাজিত যুদ্ধকে কূটনীতির মাধ্যমে বিজয়ে পরিণত করতে সক্ষম হয়। লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত সাফল্যের সুফল থেকে কাশ্মিরি জনগণ বঞ্চিত হয়ে গেল। উপরন্তু এই সঙ্গে আজাদ কাশ্মির সরকারও তাদের মূল উদ্দেশ্য হাসিলের প্রচেষ্টার চাইতে মোজাফফরাবাদের ক্ষমতার মসনদ নিয়ে অধিক ব্যস্ত থেকেছে। জাতিসংঘে সমস্যা নিয়ে বিতর্ককালে ভারত যুদ্ধবিরতির প্রতিই অধিক জোর দিচ্ছিল। অবশেষে যুদ্ধবিরতির শর্ত উহ্য রেখে কিংবা বিনা শর্তে অত্যন্ত চালাকির সঙ্গেই যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদনে সফল হয়। বহিঃআক্রমণকারী ফিরে যাওয়া এবং শান্তি-শৃঙ্খলা স্বাভাবিক পর্যায়ে আসলে গণভোট গ্রহণের মাধ্যমেই কাশ্মিরের ভবিষ্যত নির্ধারণের ওপর জোর দিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সুতরাং যুদ্ধবিরতির পর পরই ভারত কাশ্মির থেকে তার সৈন্য প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি জানায়। এবং তাঁরা স্বল্প সংখ্যক পাকিস্তানি সৈন্য (যা কাশ্মিরে মওজুদ ছিল) প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েই ক্ষান্ত হননি, উপজাতীয় মোজাহিদদের ফিরে যাওয়ার প্রতিও জোর দিতে থাকেন। এমনভাবে একদিকে কাশ্মিরের ওকালতি করতে থাকল ভারত, যার বুনিয়াদ ছিল রাজ্যের ভারতভুক্তির আইনগত বৈধতা। অন্যদিকে থাকল পাক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কাশ্মিরে একটা আজাদ সরকারের অস্তিত্বকেই তাঁরা পাত্তা দিলেন না। তাঁরা উপলব্ধি করলেন না যে, এখানে একটা সরকার ও তার সৈন্যরা যুদ্ধের ময়দানে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে যাচ্ছে। মূলপক্ষ মোয়াক্কেলকে (কাশ্মিরি জনগণ) পশ্চাতে ঠেলে দিয়ে উকিল নিজেই বনে গেল বিচারপ্রার্থীও দাবিদার। তারই ফলশ্রুতিতে একদিকে উপত্যকার জন-মানুষের মধ্যে হতাশার সঞ্চার হয়, অন্যদিকে পাকিস্তানকে সরাসরি ভারতের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। ভারতের এই চাতুর্যপূর্ণ কূটনীতির সফলতা এখানেই যে, কাশ্মিরের ময়দানে মার খাওয়ার চাইতে পাকিস্তানকে সরাসরি জড়িত করাই হবে উত্তম। এরই পরিণতিতে ১৯৬৫ সালে কাশ্মিরে যখন গেরিলা যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে, তখন ভারত সরাসরি লাহোর ও শিয়ালকোট আক্রমণ করে বসে। ফলে কাশ্মিরের মোজাহিদবাহিনীর অগ্রগতি রোধ হয়ে যায় আর কাশ্মির-যুদ্ধ চলে আসে পাকিস্তান সীমান্তে। যদি এমন হত, তখনই কাশ্মিরের যুদ্ধ কাশ্মিরেই লড়তে দেয়া হত, আর ভারতীয় সামরিক প্রাধান্যকে কাশ্মিরের পাহাড়-পর্বত আর বন-জঙ্গলেই মোকাবেলা করা হত, তাহলে সেই কবেই কাশ্মির থেকে ভারতকে বিদায় নিতে হতো।

www.pathagar.com

সূক্ষ্ম কূটকৌশলে ভারত অগ্রগামি

ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, কাশ্মির সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতই প্রথম জাতিসংঘে অভিযোগ উত্থাপন করে। তার অভিযোগ ছিল যে, পাকিস্তান ভারতেরই এলাকা কাশ্মির দখল করার নিমিত্তে উপজাতীয় বিদ্রোহীদের মদদ যোগাচ্ছে। ভারতের এই দাবি যেহেতু সত্য ছিল না, তাই পাক-ভারত জাতিসংঘ কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কাশ্মিরের পাকিস্তান কিংবা ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তির বিষয় জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমেই ফয়সালা হবে। সুতরাং কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ৫ জানুয়ারি ও ১৩ অগস্ট '৪৭ জাতিসংঘে প্রস্তাবাকারে পাশ করা হয় বটে, অতীব দুঃখের বিষয় এই ছিল যে, এই উপযুক্ত সময়ে পাকিস্তানের কিছু মৌলিক দুর্বলতা প্রকাশ পায়। এবং সূক্ষ্মভাবে এমন কিছু শর্ত এই প্রস্তাবে স্থান পায়, যার কূটকৌশলগত লাভ ভারতের পক্ষে যায়। যেমন :

১. পাকিস্তান বুনিয়াদিভাবেই মেনে নেয় যে, ভারত কাশ্মির থেকে তার সেনাবাহিনীর অধিকাংশ সদস্য প্রত্যাহার করবে। কাশ্মিরে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে না আসা পর্যন্ত ভারতীয় সৈন্যের একটা অংশ রাজ্যে অবস্থান করবে। এই বুলি কার্যকর করার সময় এই বিরোধের সৃষ্টি হয় যে, ভারত তার কত সংখ্যক ফৌজ কাশ্মিরে রাখবে। এই বিতর্কের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেতে পেতে এক পর্যায়ে আলোচনার সূত্রই ছিঁড়ে যায়। এই দীর্ঘসূত্রতায় ভারতই লাভবান হয়।

২. প্রস্তাবে বলা হয় যে, গণভোট অনুষ্ঠানের প্রধান পরিচালক কে হবেন– জম্মু ও কাশ্মির সরকারই তো নির্ধারণ করবে। এর সরাসরি অর্থ হল, মহারাজা অর্থাৎ ভারত অধিকৃত কাশ্মির কর্তৃপক্ষই গণভোট পরিচালক নির্ধারণ করবে। আর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পৃক্ত আজাদ জম্মু ও কাশ্মিরকে একটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মর্যাদা প্রদান করা হবে।

৩. প্রাথমিকভাবে কয়েক মাস পর্যন্ত পাকিস্তান বলতে থাকে যে, কাশ্মিরের বর্তমান সংঘর্ষের ব্যাপারে তার কোনও অংশগ্রহণ নেই। কিন্তু পরবর্তীতে এই কথা বলে যে, 'পাকিস্তানের সীমান্ত রক্ষার কারণেই তার সেনাসদস্য জম্মু ও কাশ্মিরে প্রবেশ করেছে। তার অর্থ হল, ভারতীয় সৈন্যরা প্রকাশ্যে প্রবেশ করল আর পাকিস্তান 'চুপে থাক আর তালাশ কর' এই কাপুরুষোচিত ভূমিকা পালন করতে থাকে। বলা হয়ে থাকে যে, পাকিস্তানের এই দুর্বল ভূমিকা কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভগ্ন স্বাস্থ্যের ওপর নিদারুণভাবে প্রভাব ফেলে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি বলেন, "জাতিসংঘ কমিশন আমার সঙ্গে কাশ্মির সমস্যার ব্যাপারে আলোচনায় বসার কথা বলেছিল; ওরা কেন আসল না!"

www.pathagar.com

কাশ্মির ইস্যু: টার্গেট রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ

হাস্যকর ব্যাপার হল, উপজাতীয় মুজাহিদদের সঙ্গে পাকিস্তানের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরাও কাশ্মির জিহাদে অংশ নেন। এই সময় পাকিস্তানের তদানিন্তন সরকারের একজন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ মাওলানা মওদুদী, যিনি কাশ্মির জিহাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন, তিনি তখন পাকিস্তানের এই দ্বিমুখি ভূমিকা পরিত্যাগ করে সত্যিকার অর্থেই সরকারিভাবে জিহাদ ঘোষণার দাবি করেন। তিনি বলেন যে, এভাবে সরকারি ঘোষণা ছাড়া জনগণের পক্ষে সশস্ত্র জিহাদ ঘোষণা করা যায় না। তখনই তদানিন্তন পাকিস্তান সরকার মওদুদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে ঘায়েল করে যে, মাওলানা মওদুদী কাশ্মির-জিহাদকে হারাম বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন। কাশ্মির-জিহাদের প্রতি জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনের ইস্যুকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতিকূলে নেওয়ার জন্যই এই মিথ্যার আশ্রয় নেয়া হয়।

দ্বিতীয়বার এই মিথ্যা অভিযোগ উথাপন করে ১৯৬৪ সালে জামায়াতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করেন জেনারেল আইয়ুব খান। মজার ব্যাপার হল, এই সময় মওদুদী যখন আদালতে এর বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দেন, তখন সরকার কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। বরং মাওলানা মওদুদী অত্যন্ত যুক্তিযুক্তভাবেই প্রমাণ করেন যে, মূলত পাকিস্তান সরকারই কাশ্মির-জিহাদের বিরুদ্ধে ছিল। এবং এই জিহাদ চলাকালীন ১৯৪৮ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘের বৈঠকে পাকিস্তানের তদানিন্তন বিদেশমন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহ খান এই ঘোষণা দেন যে, "আমরা (পাকিস্তান সরকার) কাশ্মির-যুদ্ধকে জিহাদ মনে করি না। যারা একে জিহাদ মনে করে, তাদেরকে শাস্তি প্রদান করা হচ্ছে।" প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, মাওলানা মওদুদী কাশ্মির-যুদ্ধকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করতেন বলেই তাঁকে জনগণের সামনে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য এই লজ্জাকর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়।

www.pathagar.com

জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের ভারতভুক্তি একটি নির্জলা মিথ্যা নাটক

১৯৪৭ সালের ২৭ অক্টোবর শ্রীনগর বিমানবন্দরে ভারতীয় বাহিনীর আক্রমণ শুরু হয়। এদিন সকাল নয়টায় জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যে বর্বরোচিত অভিযানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে গিয়ে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে যে, ২৭ অক্টোবরের পূর্বে অর্থাৎ ২৬ অক্টোবর রাজ্য-শাসক হরি সিং জম্মু ও কাশ্মিরকে ভারতভুক্তির চুক্তির মাধ্যমে ভারতের কাছে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের আবেদন করেছেন। সেই '৪৭ এর ২৭ অক্টোবর থেকে অদ্যাবধি দখলদার ভারত কাশ্মিরি জনগোষ্ঠির প্রাণপণ বিরোধিতা সত্ত্বেও এই রাজ্যের সিংহভাগ অংশ জবর দখল করে আছে এবং অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবেই কাশ্মিরকে অবিচ্ছেদ্য ঘোষণা করে রাজ্যের মুক্তি আন্দোলনকে অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে চালিয়ে দেয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের এই দাবি কি আইনের দৃষ্টিতে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত নাকি সাজানো নাটক ছিল? সম্প্রতি একজন ইতিহাসবিদ ও গবেষক অধ্যাপক অ্যালিস্টার ল্যাম্ব 'কাশ্মিরের বিতর্কিত আইনগত অবস্থান' নামক বইতে চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন করেছেন। তিনি জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যের ভারতভুক্তিকে সাজানো নাটক ও নির্জলা মিথ্যা বলে প্রমাণ করেছেন অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে। ব্রিটিশ শাসিত দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মির ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌরুসী রাজ্য। ১৯৪৭-এর প্রদেশসমূহের ক্ষমতা-হস্তান্তর আইনের অধীনে মহারাজা এই ক্ষমতার অধিকারী হন যে, তিনি ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন কিংবা ১৫ অগস্টের পর রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে রাজ্য প্রধানও থাকতে পারেন। ১৫ অগস্টের পূর্বে মহারাজার ইচ্ছাধীন এই ক্ষমতা ব্যবহার না করায় কাশ্মির রাজ্য স্বাধীন মর্যাদা লাভ করে। কিন্তু ভারত সরকার দু'টো বানোয়াট দলিলের ভিত্তিতে রাজ্যের স্বতন্ত্র মর্যাদায় বিলুপ্তি ঘটায়।

ক. ভারত দাবি করে যে, ২৬ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মির রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তি চুক্তিতে মহারাজা সই করেছেন।

খ. গবর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেন এই অন্তর্ভুক্তি চুক্তি অনুমোদন করেছেন।

গ. ২৬ অক্টোবর গবর্নর জেনারেল মাউন্ট ব্যাটেনের কাছে লিখিত চিঠিতে মহারাজা রাজ্যের ভারতভুক্তির অবস্থায় সামরিক হস্তক্ষেপ কামনা করে শেখ আবদুল্লাহকে রাজ্যের অস্থায়ী প্রধান নিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন।

www.pathagar.com

দু'টি দলিলেই ২৬ অক্টোবর তারিখ দেখানো হয়েছে। বলা যায়, মহারাজার এই সিদ্ধান্ত ও যোগাযোগের সময় হল একই দিন। সাম্প্রতিক নিরীক্ষণে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে যে, ভারতের এই দলিলপত্রের প্রদত্ত তারিখ সম্পূর্ণ মিথ্যার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃত ব্যাপার হল, রাজ্যের ভারতভুক্তি এবং গবর্নর জেনারেল এর নামে লিখিত পত্রে ২৬ অক্টোবর মহারাজার পক্ষে দস্তখত করার কোন অবকাশই ছিল না। বরং এর জন্য সম্ভাব্য নিকটতম সময় ছিল ২৭ অক্টোবর সন্ধ্যা। কেননা ২৬ অক্টোবর মহারাজা হরি সিং শ্রীনগর থেকে জম্মুর দিকে সড়ক পথেই সফরে ছিলেন এবং তাঁর প্রধানমন্ত্রী এম.সি. মহাজন নতুনদিল্লিতে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় রত ছিলেন। আর রাজ্য বিষয়ক মন্ত্রী ভি. পি. মেননও ২৬ অক্টোবর দিল্লিতেই ছিলেন; সেখানেই তিনি রাত কাটান। অনেকেই তাঁকে সেখানে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ২৬ অক্টোবর জম্মু–দিল্লি সড়কপথে মহারাজার সঙ্গে যোগাযোগের কোনও প্রকার উপায় ছিল না। এ ছাড়া ২৭ অক্টোবর সকাল ১০ টায় ভি.পি মেনন ও এমসি মহাজন দিল্লি থেকে জম্মুর দিকে রওনা হন এবং ২৭ অক্টোবরেই মহারাজা এমসি মহাজনের কাছ থেকে দিল্লি আলোচনার বিষয়ে অবহিত হন। উল্লেখিত এই বাস্তব সত্য ও অকাট্য প্রমাণের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তথাকথিত প্রমাণযোগ্য ভারতভুক্তির দলিলপত্রে ভারতীয় সামরিক অনুপ্রবেশের পর জোরপূর্বক দস্তখত নেওয়া সম্ভব ছিল। অথচ ভারতীয় দখলদার বাহিনী শ্রীনগর বিমানবন্দরে অবতরণের মুহূর্তে এটা ছিল একটি স্বাধীন রাজ্য। সুতরাং ভারতের সঙ্গে এ সময় কোনও চুক্তি মূলত বল প্রয়োগের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকার এই অভিযোগ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দলিলপত্রের তারিখ ২৬ অক্টোবর উল্লেখ করেছে এবং ভি.পি মেনন তাঁর 'রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্তি' নামক বইতে (১৯৫৬ সাল) মহারাজার অন্তর্ভুক্তি-চুক্তিতে সই প্রদানের সময় 'আমি উপস্থিত ছিলাম' বলে যে দাবি করেছেন, তা আসলে ডাহা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। মূলত মেনন সত্য গোপন করার জন্য ভারতের ক্রীড়নক হিসাবেই ব্যবহৃত হয়েছেন। কাশ্মির রাজ্যের ভারতভুক্তি বিষয়ক এই দলিলপত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তারিখ। আর এই তারিখ মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ার পর এর কোনও আইনগত ভিত্তিই থাকে না এবং এর বৈধ অবস্থান হয়ে পড়ে সন্দেহ-সংশয়যুক্ত। মূল ব্যাপার ছিল, শ্রীনগরে বর্বরোচিত অভিযানের পূর্বেই মহারাজা ও মাউন্ট ব্যাটেনের মধ্যেকার চিঠিপত্র তৈরি করে মেনন ও মহাজনের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২৮ অক্টোবর লন্ডন টাইমসও এ কথা উল্লেখ করেছে।

আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, ১৯৪৮ সালের মার্চে প্রকাশিত শ্বেতপত্র, যা ভারত সরকার জম্মু ও কাশ্মিরের ওপর যথারীতি মকদ্দমা পেশ করেছে, সেখানে মহারাজার সইযুক্ত অন্তর্ভুক্তি চুক্তি পেশ না করে দস্তখতহীন অস্পষ্ট দলিলই প্রদান করা হয়। এ যাবৎ হিন্দুস্থান সরকার মহারাজার দস্তখতকৃত অন্তর্ভুক্তি চুক্তি প্রকাশ করেনি, বরং ১৯৬০ সালের পর থেকে ২৬ অক্টোবরের তারিখ সম্বলিত সন্দেহযুক্ত দলিলই প্রকাশ করেছে। বাস্তবিকপক্ষে মহারাজার সইকৃত সঠিক অন্তর্ভুক্তি চুক্তির কোনও অস্তিত্ব নেই।

www.pathagar.com

বস্তুতপক্ষে মহারাজা হরি সিং ডোগরা তখন পুঞ্চ-বিদ্রোহসহ অভ্যন্তরীণ সমস্যায় জর্জরিত ছিলেন। রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বহাল রেখেই তিনি হিন্দুস্থানের সহযোগিতা-প্রত্যাশী ছিলেন। ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭ থেকে আজ অবধি এই গুরুতর তথ্য পাথর চাপায় পড়ে আছে। এ কথাও প্রনিধানযোগ্য যে, যথাসময়ে পাকিস্তান সরকার ভারতীয় বেআইনী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে অবহিত হলে আন্তর্জাতিক ফোরামে কাশ্মির সমস্যার প্রকৃতিই হত বিপরীত এবং প্রাথমিকভাবেই ভিন্ন ধরনের। আর জাতিসংঘ যদি সঠিক তথ্য সম্পর্কে অবহিত হত, তা হলেও ভারতের বক্তব্য হত নিষ্প্রাণ।

আজ যখন কাশ্মির একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এ সমস্যার প্রকৃতিগত সত্য প্রকাশিত হয়েছে, তখন জাতিসংঘের উচিত আন্তর্জাতিক নিরপেক্ষ ট্রাইবুনালের মাধ্যমে দুনিয়ার সম্মুখে সঠিক রহস্য উদঘাটন করা।

www.pathagar.com

১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ : শান্তির সন্ধানে সুদীর্ঘ পথযাত্রা

কাশ্মির সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান তথা জাতিসংঘের প্রস্তাব ও ভারতের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক এখানে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রচেষ্টায় সবচাইতে সচল-কাল হল ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল। এই সময় কাশ্মির সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার পাকিস্তানভুক্তির ধারণাই ছিল যুক্তিযুক্ত। উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এই চেতনাই কাশ্মিরের মুসলিম জনগোষ্ঠিকে আকৃষ্ট করে। এই চেতনা পাকিস্তান আন্দোলনকেও করে শক্তিশালী। মহারাজার বিরুদ্ধে কাশ্মিরি মুসলমানদের আন্দোলন সামরিক-শক্তি প্রয়োগেও দমন করা যায়নি। এই কারণেই মহারাজা তাঁর সাহায্যের জন্য ভারতের কাছে আবেদন করেন আর ভারতভুক্তির চুক্তি-নাটকের মাধ্যমে ভারত কাশ্মিরে সামরিক হস্তক্ষেপ করে। মহারাজার স্থিতাবস্থা চুক্তির কারণে কাশ্মির রাজ্যের প্রতিরক্ষা, বিদেশ মন্ত্রণালয় ও যোগাযোগের ব্যাপারে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপ ছিল মূলত বৈধ ও আইনসম্মত। কাশ্মিরি মুসলমানদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে তা ছিল অনিবার্য। কিন্তু সুদীর্ঘ অর্ধশতাব্দিকাল অতিক্রান্ত হওয়ার পরও পাকিস্তান তার এই আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। বরং তার উল্টো ভারত কাশ্মির রাজ্যে তার 'আইনগত অধিকার' আর পাকিস্তান নিছক নৈতিক অধিকার নিয়েই কাশ্মির সমস্যার ব্যাপারে বৈধ অবস্থান রাখে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত পাকিস্তান এই আইনগত অধিকারের স্বীকৃতির দাবি আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপনের চিন্তা-ভাবনা করেই কাটিয়ে দেয়। আর এখন আন্তর্জাতিক আদালতের আশ্রয় নেওয়ার পরিবর্তে বিষয়টিকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবেই গ্রহণ করা সমীচিন মনে করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার-নীতির ভিত্তিতে এই সমস্যার সমাধান তালাশ করাই হবে উত্তম।

ভারত যখন কাশ্মির সমস্যা জাতিসংঘে উত্থাপন করে, তখন কাশ্মির সম্পর্কিত ব্যাপারে পাকিস্তানের অবস্থান ছিল নিম্নরূপ:

ক. যুদ্ধবিরতি-রেখা থেকে জম্মু ও কাশ্মির উপত্যকা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক অংশ ভারতের দখলে চলে যায়; অপর অংশ থাকে পাকিস্তানের হাতে। পাকিস্তানের আজাদ কাশ্মির ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলনের বেইজ ক্যাম্প হিসাবে কাজ করে।

খ. ভারত অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মির আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটা বিতর্কিত এলাকা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

গ. এই সমস্যার সমাধানে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে জনগণের স্বাধীন গণভোটের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে রাজ্যের ভবিষ্যত নির্ধারিত হবে বলে সর্বজনস্বীকৃত হয়।

ঘ. কাশ্মির রাজ্যে ভারতীয় সামরিকবাহিনী আগ্রাসি শক্তি হিসাবেই স্বীকৃত হয়। আর পাকবাহিনীকে রাজ্যের মুসলিম জনগণের সহযোগী বলে মনে করা হত।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের পাশ করা সকল প্রস্তাবই ছিল কাশ্মিরি জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সহায়ক এবং কাশ্মির সম্পর্কিত পাকিস্তানি

www.pathagar.com

দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন। ১৯৫৬ থেকে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাশ্মির সম্পর্কিত ভারতের নীতি ছিল যে, ছলে-বলে-কৌশলে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের স্বীকৃত নীতি থেকে যেন নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। রাজ্যের স্থানীয় নির্বাচন, যা ভারতের সরকারি নিয়ন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হয় এবং সম্পূর্ণ প্রহসনমূলকই ছিল, এই নির্বাচনকে ভারত আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রথম পদক্ষেপ বা বিকল্প বলে প্রচার করতে থাকে। জাতিসংঘ ১৯৫৬ সালে ভারতের এই দাবি সম্পূর্ণভাবেই প্রত্যাখ্যান করে দেয়। '৪৮ সাল থেকে '৫৬ সাল পর্যন্ত জাতিসংঘের মঞ্জুরকৃত প্রস্তাবসমূহ ছিল মূলত ত্রিপক্ষীয় অর্থাৎ পাক-ভারত-কাশ্মিরি জনগণের মধ্যকার আন্তর্জাতিক চুক্তির পর্যায়ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের আবেদনের উদ্দেশ্যই ছিল সংকট (কালক্ষেপণ) মুহূর্তকে কোনও না কোনও ভাবে অতিক্রম করা এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্র-যন্ত্রের সহযোগিতায় সুচিন্তিত পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণের আন্দোলন-চেতনার অবদমন করা। সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মিরি জনগণকে ভারতীয়করণের মাধ্যমে তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বও বিলীন করা এবং জনগণের স্বাধীনতার চেতনা বিলুপ্ত ও পাকিস্তানের সম্ভাব্য সহযোগিতাকে প্রতিরোধ করার জন্য সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা। আর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে কূটনৈতিক ছল-চাতুরির মাধ্যমে কাশ্মিরের ভারতভুক্তিকে বৈধতার আচ্ছাদন প্রদান করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজন ছিল দীর্ঘ সময়ের। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ভারত তার এই উদ্দেশ্য সাধনে সফল হয়নি। কেননা '৪৮ থেকে '৫৬ সাল পর্যন্ত কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বৃহদশক্তিগুলোর স্বার্থ-দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হয়নি। এমনকি বরাবরই ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল সোভিয়েত ইউনিয়নও নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের পক্ষে ভোট প্রদানে বিরত ছিল।

জাতিসংঘের কয়েক মাসের কূটনৈতিক আলাপচারিতার ফলশ্রুতিতে কাশ্মিরি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের ওপর তথাকথিত আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রচেষ্টাই প্রাধান্য বিস্তার করে। আর ভারত সাময়িকভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রস্তাব মেনে নিয়ে সামরিক উপায়ে সমাধান-প্রচেষ্টার সম্ভাবনাকে তিরোহিত করে দেয়। এবং স্বাধীনতা যুদ্ধকে কূটনৈতিক কুটিল খাঁচায় বন্দি করে দেয়।

ভারত সাময়িকভাবে কাশ্মিরে গণভোটের মূলনীতির সঙ্গে ঐকমত্য ঘোষণা করার মাধ্যমে সামরিক প্রচেষ্টার সম্ভাবনাকে খতম করে পুরো ব্যাপারটাকেই কূটকৌশলের পরিধিতে আবদ্ধ করে নেয়। এদিকে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মির সমস্যা ছাড়াও অন্যান্য সমস্যার দিকে অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সুতরাং জওহরলাল নেহেরু ভারত-পাকিস্তান নদির পানি-বিরোধ মিটমাট করার উদ্যোগ নেন। এই পানি বিরোধ সমাধানের লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে মি. নেহেরু আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই ধারণা প্রদান করেন যে, কাশ্মির সমস্যাও আলাপ-আলোচনার দ্বারা সমাধান করা সম্ভব। সুতরাং নদির পানি-বিরোধ চুক্তি স্বাক্ষরের পর কাশ্মিরিদের সামরিক প্রচেষ্টার সম্ভাবনা শীতল হয়ে পড়ে। জনগণের আন্দোলন রাজনৈতিক প্রচেষ্টা ও কূটনৈতিক কৌশলের এক দীর্ঘসূত্রতার নিগড়ে আটকা পড়ে যায়।

www.pathagar.com

পাকিস্তান ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া ছাড়াও নিজেই জাতিসংঘে বিচারপ্রার্থী হয়েছে ভারত। যেখানে পাকিস্তানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার জাফরুল্লাহ খান ও হিন্দুস্থানি প্রতিনিধি গোপালা স্বামী নিজ নিজ অবস্থানের কথা বলেছেন। '৪৮ এর ডিসেম্বর মাসে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ হয়। এই প্রস্তাবের ওপর পর্যালোচনার জন্য পাক প্রধানমন্ত্রী লেয়াকত আলী খানের সভাপতিত্বে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে কাশ্মির স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিসংবাদিত নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাসকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। কাশ্মির স্বাধীনতা যুদ্ধের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে চৌধুরী গোলাম আব্বাস যুদ্ধবিরতির ঘোর বিরোধিতা করেন। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ চৌধুরী সাহেবের শত বিরোধিতা সত্ত্বেও যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ করে।

কাশ্মির-বিরোধ বছরের পর বছর নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কের বিষয়বস্তু থাকল। স্যার জাফরুল্লাহ, জুলফিকার আলী ভুট্টো, বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত ও ভি.কে. মনিনের মধ্যে ক্রমাগত ও বিরতিহীন বিতর্কের দৃষ্টান্ত স্থাপিত হল। নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাশ হয়। প্রস্তাব বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণের জন্য প্রতিনিধিদল ও বিশেষ দূতকে আজাদ কাশ্মির ও অধিকৃত কাশ্মিরে প্রেরণ করা হয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার যে তিমিরে, সে তিমিরেই থেকেছে। সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে পরিস্থিতি দিন দিন আরও জটিল আকার ধারণ করেছে।

'৪৮ এর যুদ্ধবিরতির পর আজাদ কাশ্মিরে একদলীয় স্বৈরাচারী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়। ডোগরা শাসনে যেটুকু ভোট প্রদানের অধিকার ছিল, তা থেকেও জনগণকে বঞ্চিত করা হল। পাকিস্তানের কাশ্মির বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারির ক্ষমতা এমন ছিল যে, আজাদ কাশ্মিরের প্রেসিডেন্টকেও তিনি বরখাস্ত করতে পারতেন।

১৯৫৫ সালের নবেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী করাচি শহরে পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলকে নিয়ে সর্বদলীয় কাশ্মির কনফারেন্স আহবান করেন। এই সম্মেলনে কাশ্মিরি নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ও বিচারপতি শেখ দ্বীন মোহাম্মদ যৌথভাবে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করলে মিয়া মমতাজ দৌলতানার সমর্থনের মাধ্যমে তা পাশ করা হয়। প্রস্তাবে আজাদ কাশ্মিরে একটা প্রতিনিধিত্বশীল ও ক্ষমতাবান সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতি জোর দেওয়া হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কাশ্মির সম্পর্কিত অন্যান্য প্রস্তাবের মত এই প্রস্তাবও কার্যকারিতার মুখ দেখতে পারেনি।

এদিকে অধিকৃত কাশ্মিরে শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহকেও মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হয় অগণতান্ত্রিকভাবে। এ ছিল ১৯৫৩ সালের ১৯ অগস্টের দিন। নয়াদিলির এই হঠকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সারা কাশ্মিরে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। শত শত লোক নিহত হয়। হাজার হাজার প্রতিবাদী জেলখানায় বন্দি হয়। উভয় কাশ্মিরে পুনরায় গণভোট অনুষ্ঠানের দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। এই অশান্ত পরিস্থিতিতেও তদানিন্তন পাক প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়া ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে যান ভারতে। পাক প্রধানমন্ত্রী ভারতে গিয়ে পুরো অবস্থাটাকেই অবহেলা করে এক হাস্যকর বিবৃতি প্রদান করেন।

www.pathagar.com

১৯৫৮ সালের দিকে পাকিস্তান সরকারের ভূমিকা উপলব্ধি করে বেশ ক'জন কাশ্মিরি নেতা অনেকটা হতাশাগ্রস্ত হয়ে কাশ্মিরের যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করার আন্দোলন শুরু করেন। এইসব কাশ্মিরি নেতার অন্যতম ছিলেন চৌধুরী গোলাম আব্বাস, জাস্টিজ খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ, কে.এইচ. খোরশেদ ও সরদার ফতেহ মোহাম্মদ। এই নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী স্যার ফিরোজ খান নুনকে এই বলে আন্দোলন শুরু করেন যে, অধিকৃত কাশ্মিরে সীমাহীন জুলুম-অত্যাচার চলছে। সীমান্তের এপারের কাশ্মিরি জনগোষ্ঠির উচিত ওপারের জনগণের আজাদি আন্দোলনে সহযোগিতা করা; তাদেরকে উৎসাহ প্রদান করা। নেতৃবৃন্দ আরও সতর্ক করে দেন যে, পাকিস্তান সরকার যদি কোনও প্রকার আশাপ্রদ ভূমিকা নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাঁরা নিজেরাই উপযুক্ত কোনও পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন। তখন কাশ্মিরি জনগণ শ্লোগান দিতে থাকে, "নেহেরু ছে না নুন ছে, কাশ্মির মিলেগা খুন ছে"। অবশেষে '৫৮ এর ২৭ জুন এসব নেতাকে রাওয়ালপিন্ডি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এক পর্যায়ে পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি করে সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণার পর এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে মুক্তি প্রদান করা হয়।

১৯৬২ সালে পুনরায় চৌধুরী গোলাম আব্বাসের নেতৃত্বে লাহোরে সর্বদলীয় কাশ্মির কনফারেন্স ডাকা হয়। এই সম্মেলনেও জম্মু ও কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সর্বপ্রকার চেষ্টা সাধনার ওপর জোর দেওয়া হয়। এতে বলা হয় যে, কাশ্মিরের পাকিস্তানভুক্তি ছাড়া পাকিস্তান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সম্মেলনের প্রস্তাবনা কার্যকর করার কৌশল নির্ধারণের জন্য খাজা নাজিমুদ্দিন, হোসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী প্রমুখের মত পাকিস্তানের খ্যাতিমান নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। কিন্তু এই প্রচেষ্টাও আশানুরূপ কোনও ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি।

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে ব্যর্থতার পর সম্পাদিত তাসখন্দ চুক্তি কাশ্মিরের জনগণের মধ্যে নিদারুণ হতাশার সঞ্চার করে। এই চুক্তি ঘোষণার পর উপত্যকার জনগোষ্ঠির মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে থাকে যে, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন মূলত নিজেদের হাতেই নিতে হবে। এই সময় "জাতীয় স্বাধীনতা শিবির" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। কাশ্মিরি স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদ মকবুল বাট এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সশস্ত্র আন্দোলনের সূত্রপাত করেন এবং নিজের জীবন দিয়ে বর্তমান আন্দোলন গতিশীল করেন।

www.pathagar.com

কাশ্মির সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান-প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্যায়

কাশ্মির সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান-প্রচেষ্টার দ্বিতীয় পর্যায় ১৯৫৬ থেকে শুরু হয়ে ১৯৬৫ পর্যন্ত এসে ক্ষান্ত হয়। এই সময়কালের মধ্যে ক্রমান্বয়ে কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বিষয়ে স্বীকৃত নীতিমালার প্রতি নিরাপত্তা পরিষদের আগ্রহ হ্রাস পেতে থাকে। এদিকে এ সমস্যার অন্যতম প্রধান পক্ষ পাকিস্তানের জন্য এই সময়টা ছিল গুরুতর রাজনৈতিক অস্থিরতার কাল। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ অনৈক্য, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চরম আকার ধারণ করে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের প্রতি বেআইনি পদক্ষেপ, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলার অনুপস্থিতি ও মানবাধিকার নীতিমালা অনুসরণে অসতর্কতা– ইত্যাদি কারণে কাশ্মির সমস্যার ব্যাপারে আশানুরূপ বৈদেশিক সমর্থন আসেনি। সকাল-সন্ধ্যা মন্ত্রিপরিষদ গঠন-ভাঙ্গনের মত হাস্যকর অবস্থারও সৃষ্টি হয়। এই অশান্ত ও অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সুচিন্তিত ও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করার মত পরিবেশ ছিল না। এই সময় যখনই কাশ্মির সমস্যাকে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, ভারতের চাতুর্যপূর্ণ ও কার্যকর কূটনৈতিক কর্মকাণ্ডের কাছে ততই নিরাশ হতে হয়েছে। এই সময় পাকিস্তান সিয়াটো (SEATO) ও সেন্টো'র (CENTO) মত সামরিক চুক্তিতে শামিল হয়ে পড়ে। সোভিয়েত-আমেরিকার মধ্যেকার শীতল যুদ্ধের এটা ছিল যৌবনকাল। এই শীতল যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দুই বৃহৎ শক্তির দ্বন্দ্বের শিকার হয়ে পড়ে। ভারত জাতিসংঘের প্রস্তাব বাস্তবায়নে বিভিন্ন টাল-বাহানা করতে থাকে। এই অবস্থায় কাশ্মিরে গণভোট অনুষ্ঠানের পূর্বে এখানে জাতিসংঘের শান্তি-ফৌজ প্রেরণের প্রস্তাবও সোভিয়েত রাশিয়া বাতিল করে দেয়। এরই ফলে এক পর্যায়ে ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৭-এ কাশ্মির সমস্যার ওপর নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে সোভিয়েত রাশিয়া ভেটো প্রদান করে বসে। এছাড়া ২২ জুন, '৬২-এ এই সমস্যার ওপর নিরাপত্তা পরিষদে ভোটাভোটির সময় মিসর ও ঘানা ভোট প্রদান থেকে বিরত থাকে। বস্তুত তা ছিল পাকিস্তানের জন্য গুরুতর কূটনৈতিক ব্যর্থতা আর ভারতের বিরাট কূটনৈতিক বিজয়। এর মাত্র দুই বছর পর অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মির সমস্যার ওপর কোন প্রস্তাবই পাশ করাতে পারেনি; একটা সাধারণ বিবৃতি মাত্র আদায় করতে সক্ষম হয়। ১৯৬৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদ তো কাশ্মির সমস্যার ব্যাপারে কোনও প্রকার আলোচনা করতেও অস্বীকার করে। উপরন্তু যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ইশারা-ইঙ্গিতে "সেই রাজনৈতিক সমস্যা, যা এই বিরোধের অন্তর্নিহিত কারণ" বাক্যটি দিয়েই পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট রাখা হয়। কাশ্মির বিরোধের এই দ্বিতীয় স্তরের সময় কাশ্মিরি জনগণ এই আশা নিয়ে বসে ছিল যে, পাকিস্তান তাদের সমস্যা সমাধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এমনকি সামরিক শক্তি প্রয়োগেও দ্বিধা করবে না। কেননা এই সময় ভারত ও পাকিস্তানের সামরিক শক্তির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না। তখন ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতেও সমীহ করত।

www.pathagar.com

১৯৬২ সালে ভারত-চিন সীমান্ত-যুদ্ধকালে ভারত তদানিন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের কাছ থেকে এই ওয়াদা গ্রহণ করে যে, ভারত যতদিন চিনের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত থাকবে, ততদিন যেন পাকিস্তান কাশ্মিরে সামরিক হস্তক্ষেপ না করে। পাকিস্তান এই প্রতিশ্রুতি পালন করলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মির সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের ব্যবস্থা করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেন। এই খবরের উৎস মতে, যা বিদেশি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, নেহেরু ও চরন সিং এই ইঙ্গিতও প্রদান করেন যে, তাঁরা অধিকৃত কাশ্মিরের কিয়দংশ পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত আছে। পাকিস্তানের বাইরে বিদেশি প্রেসে প্রকাশিত এই খবর যদি সত্য হয়, মূলত এটা একটা ভারতীয় নেতৃত্বের চালবাজি বৈ আর কিছুই ছিল না। ভারত তখন অতীব সংকটাপন্ন অবস্থা কাটিয়ে ওঠারই প্রয়াস পেয়েছিল।

www.pathagar.com

'৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ: নেপথ্যের জিব্রালটার কাহিনী

কাশ্মিরকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী অপারেশন জিব্রাল্টার (Operation Gibraltar) নামের একটা সশস্ত্র পরিকল্পনা তৈরি করে। এই পরিকল্পনার পশ্চাতে বুনিয়াদি চিন্তা ছিল যে, পাকিস্তানি কমান্ডো এবং কাশ্মিরি স্বাধীনতাপ্রিয় গোষ্ঠি যৌথভাবে পশ্চাতে থেকে ভারতে কঠোর আঘাত হানবে আর পাক-ফৌজ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে থাকবে। পরিকল্পনাকারীরা মনে করেছিলেন যে, হয়ত এই যুদ্ধকে ভারত আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা পর্যন্ত প্রসারিত করবেন না। তাঁরা ভেবেছিলেন, কাশ্মিরের বিতর্কিত এলাকার মধ্যেই এই যুদ্ধ সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে তার বিপরীতই পরিলক্ষিত হয়। ভারত এই যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পর্যন্ত যেমন সম্প্রসারণ করে, তেমনি কাশ্মিরের অভ্যন্তরে ভারতবিরোধী তেমন কোন কার্যকর বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠেনি। অপারেশন জিব্রাল্টার– যা '৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ নামেই খ্যাত– পরিচালনার সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাশ্মির সমস্যার ব্যাপারে পাকিস্তান অনেকটা ভাল অবস্থানেই ছিল। নৈতিক দিক দিয়ে কাশ্মিরের ওপর পাকিস্তানের অধিকার ভারতের চেয়ে অধিক বলেই মনে করা হত। তাছাড়া কাশ্মির সমস্যার ওপর পাকিস্তানি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি চিনের ছিল পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা। উপরন্তু এই সময়ে সোভিয়েত রাশিয়াও অনেকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালনে আগ্রহী ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের তদানিন্তন সামরিক নীতিনির্ধারকরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেন। পাকিস্তানের উচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব যুদ্ধে চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা দেখাতেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হন। মাত্র ষোল দিন যুদ্ধ পরিচালনার পর আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করে। বস্তুতঃপক্ষে এই ধরনের একটা যুদ্ধকে তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার মত প্রয়োজনীয় ইচ্ছা-শক্তির প্রচণ্ড অভাব ছিল পাকিস্তানের তদানিন্তন নেতৃত্বে। মনে করা হয় যে, সম্ভবত পাকিস্তান-নেতৃত্ব নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সমস্যা সমাধানের প্রয়াসেই এই যুদ্ধ-খেলা শুরু করে। প্রকৃতই ১৯৬৫ সালে শেষবারের মত কাশ্মির সমস্যাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিচার-বিবেচনা করা হয়। পরবর্তীকালে জিব্রাল্টার অপারেশনের ব্যর্থতা কাশ্মির সমস্যায় পাকিস্তানের কর্মকৌশলে ক্রমাগত ছায়া ফেলতে থাকে। কাশ্মিরকে নিয়ে পাকিস্তানের কর্মকৌশলের এই পর্যায়ে পাক-ভারত দ্বিপক্ষীয় আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান বের করারও উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগ প্রথমে ১৯৬২ সালে এ্যাংলো আমেরিকান চাপের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। এবং পরবর্তীতে সোভিয়েত ইউনিয়নও এ প্রচেষ্টায় শামিল হয়। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে যুদ্ধের পর সোভিয়েত কর্তৃক পাক-ভারত তাসখন্দ চুক্তি এই প্রচেষ্টারই অংশ ছিল।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধকে অনেক কাশ্মিরি নেতা কাশ্মিরের আজাদির জন্য সংগঠিত যুদ্ধ বলেই মেনে নিতে চান না। তাঁরা মনে করেন, এই যুদ্ধ ছিল মূলত পাকিস্তানের কিছু জেনারেল, গুটি কয়েক পেশাদার রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের নিজস্ব যুদ্ধ। নিজেদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য বিনা পরিকল্পনায়

www.pathagar.com

তাঁরা মুজাহিদদেরকে যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করিয়েছেন। কাশ্মিরের অবিসংবাদিত নেতা চৌধুরী গোলাম আব্বাসের মত ব্যক্তি এই যুদ্ধে গঠিত "বিপ্লবী কাউন্সিলের" সদস্য হতে অস্বীকৃতি জানান। কেননা তাঁরা এই যুদ্ধকে একটা ভুল পদক্ষেপ বলে মনে করতেন। এমনকি ১৯৪৭-৪৮ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্যতম নায়ক ও দীর্ঘদিনের আজাদ কাশ্মিরের প্রেসিডেন্ট সরদার আবদুল কাইউম খানও এ-কে অপরিপক্ক ও খামখেয়ালি সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, "এই সময় কাশ্মিরি নেতাদেরকে আস্থায় আনা কিংবা অবহিত করাতো দূরে থাক, তাদের কী করণীয়, সে কথা পর্যন্ত বলা হয়নি। আমার বাড়ি ছিল রেজিমেন্টাল স্কুলেরই পাশে। সেই সুবাদেই জানতে পারতাম, কী হতে যাচ্ছে। তাই নিজেই জেনারেল ও উইং কমান্ডার ও অন্যান্য দায়িত্বশীলের কাছে গিয়ে আকুতি-মিনতি করেছি, যাতে এমন ভুল পদক্ষেপ না নেন। কিন্তু এই সব আবেদন-নিবেদন বিবেচনাযোগ্য মনে করা হয়নি।" তিনি আরো বলেন, কাশ্মিরের বরেণ্য নেতৃবৃন্দ চৌধুরী গোলাম আব্বাস, মীর ওয়ায়েজ মোহাম্মদ ইউসুফ শাহ, কে.এইচ. খোরশিদ, সরদার ইব্রাহিম খান প্রমুখের মত ব্যক্তিত্ব এই পরিকল্পনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবিহিত ছিলেন। যাঁরা গাদা বন্দুক দিয়ে পনের মাস যুদ্ধ করে বিশ হাজার বর্গমাইল এলাকা স্বাধীন করলেন, জিব্রাল্টার পরিকল্পনা প্রণয়নকালে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজনবোধ হয়নি!

এই যুদ্ধে পাকিস্তানের ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে পাকিস্তানের তদানিন্তন সেনাপ্রধান জেনারেল মুসা খানও কাশ্মিরি নেতাদের সঙ্গে অভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলন, "উপত্যকার অভ্যন্তরে এই জটিলতর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব-প্রস্তুতি না থাকার কারণেই মূলত এই অভিযান ব্যর্থ হয়। আমরা আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে জননেতাদের সঙ্গে কোনও প্রকার পরামর্শ করিনি। এই গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য উপত্যকায় একটা উপযোগী গোপন সংগঠনের নিতান্ত প্রয়োজন ছিল, যাতে করে পরস্পরের উত্তম সহযোগিতায় এই মিশন সফল হতো। প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, খাদ্য, পানি, চিকিৎসা ইত্যাদির ক্ষেত্রে গেরিলা মুজাহিদদের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। উপত্যকার মুসলিম জনগণ আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য সদা প্রস্তুত ছিল। কিন্তু তারা এসময় সহযোগিতা করতে পারেনি। এর প্রথম কারণ হল, কাশ্মির উপত্যকায় ভারতের পাঁচ পদাতিক ডিভিশন ও শক্ত বেসামরিক সশস্ত্র ফোর্সের উপস্থিতিতে জনগণের প্রকাশ্য সহযোগিতা সম্ভব ছিল না। এছাড়া যে অবস্থায় আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছি, সে অবস্থায় একটা অস্পষ্ট ও অনির্ধারিত উদ্দেশ্যে (যার সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই) জনগণের জান কোরবান করার ধারণাই ছিল অলীক কল্পনা। তাড়াহুড়ার কারণে গেরিলা আক্রমণের সহযোগিরা কাশ্মিরি জননেতাদেরকে আস্থায় আনতে পারেনি। ফলে তারা অন্ধকারে থেকেছে। অথচ তাদের কাছ থেকে সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা পাওয়া যেত।"

পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের হাঁড়ির খবর রাখেন, এমন একজন কলামিস্ট মীর আবদুল আযিয তাঁর এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, "বস্তুত পঁয়ষট্টি সালের জিব্রাল্টার পরিকল্পনা ছিল তদানিন্তন পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর

www.pathagar.com

কেবিনেট সেক্রেটারি আজিজ আহমদ ও মি. নজির আহমদেরই সৃষ্ট। তাঁরা বার বার প্রেসিডেন্ট আইউব খানের ওপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন কাশ্মিরে গেরিলা আক্রমণ করার জন্য। এমতাবস্থায় পাক সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে (GHQ) একটা পরিকল্পনার কথা বলা হলে সেনাপ্রধান জেনারেল মুসা খান এই বলে কথিত পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন যে, 'সেনাবাহিনীর নিয়মিত আরও দুটি সশস্ত্র ডিভিশন তৈরির পূর্ব পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কখনও উচিত হবে না।' সেনাপ্রধানের দ্বিমত সত্ত্বেও অবশেষে কাশ্মিরে গেরিলা আক্রমণের পরিকল্পনা তৈরি করার জন্য প্রেসিডেন্টের কড়া নির্দেশ তখনই প্রদান করা হয়, যখন প্রেসিডেন্ট আইউব তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান নড়বড়ে দেখতে পান।" প্রবন্ধকার দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, "প্রেসিডেন্ট আইউব খান যখন দেখেন যে, তাঁর নির্বাচনী অবস্থান যেমন নিম্নগতির দিকে মোড় নিচ্ছে, তেমনি করাচির গোষ্ঠিগত ঝগড়া-বিবাদের কারণে আইউব খানের জনপ্রিয়তা যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে, তখনই তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো এই পরামর্শ প্রদান করেন যে, 'হৃত মর্যাদা ও জনপ্রিয়তা কাশ্মিরে গেরিলা কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমেই পুনঃবহাল করা যেতে পারে।"' পাকিস্তানের একজন জাঁদরেল জেনারেল শের আলী খানও মীর আবদুল আযিযের অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। প্রবন্ধকার জেনারেল শের আলী খানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, ১৯৭১ সালে যখন সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শ ও প্রভাবেই সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, অনুরূপভাবে ১৯৬৫ সালে জেনারেল আইউব খানও ভুট্টো ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের কুপরামর্শ ও প্রভাবের মুখে অপরিণামদর্শী জিব্রাল্টার অপারেশন শুরু করেন। ভুট্টো ও তাঁর সহযোগীদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, জেনারেল আইউব খান যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে চতুর্দিকের প্রভাব ও সমালোচনার মুখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বেন এবং এই যুদ্ধে অকৃতকার্যতার ফলে আমাদের এই কথা প্রচার করার সুযোগ আসবে যে, জেনারেল বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। সুতরাং তাঁর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত যুব নেতৃত্বের সুযোগ দেওয়া হউক। যুদ্ধ শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই আইউব খান মি. ভুট্টোর ষড়যন্ত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। ফলে কালবিলম্ব না করে জেনারেল আইউব যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করেন এবং তাসখন্দ চুক্তিতে সই করে দেন। পাক-ভারত তিন-তিনটি যুদ্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একজন কাশ্মিরি অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল রশিদ আব্বাসি বলেন, "প্রকৃতপক্ষে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ ছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার যুদ্ধ। আমরা যখন অধিকৃত কাশ্মিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করছিলাম, তখনই স্পষ্ট ভাষায় বলেছি যে, আমাদের সবার (গেরিলারা) জীবনের বিনিময়েও যদি কাশ্মির স্বাধীন হয়, তাহলে স্বাধীনতার জন্য এ জীবন নিতান্তই নগণ্য হবে। তবে যে অবস্থায় এবং যেভাবে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে, আমি নিশ্চিত যে, এভাবে এই পরিকল্পনা কৃতকার্য হবে না"।

এমনিভাবে পরিকল্পনাকারীদের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার অভাব, অপরিণামদর্শিতা ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের ফলে জিব্রাল্টার নামক চড়ামূল্যের উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতা নিছক একটা সামরিক প্রচেষ্টার ক্ষণিকের ব্যর্থতাই ছিল না, বরং এটি কাশ্মিরিদের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সমাজ জীবনের ওপর

www.pathagar.com

এক সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। উল্লেখিত কারণসমূহের ফলে অপারেশন জিব্রাল্টার-এর যেমন উল্টো প্রতিক্রিয়া হয়, তেমনি এটি একটি তুমুল বিশ্বখ্যাত যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। যুদ্ধবিরতির পর ভারত কাশ্মিরি জনগণের ওপর পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনের স্বাভাবিক অভিযোগে চরম অমানবিক অত্যাচার-অবিচার চালাতে থাকে। অন্যদিকে পাকিস্তানেও কিছু স্বার্থান্বেষিমহল এই বলে প্রচারণা চালাতে থাকে যে, কাশ্মিরি জনগণ তাদেরই স্বার্থে পরিচালিত যুদ্ধে পাকিস্তানকে সহযোগিতা করেনি।

www.pathagar.com

শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রচেষ্টার তৃতীয় পর্যায়

'৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পর উভয়পক্ষের সম্মতিতে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হয়। ১৯৬৬ সনের ১০ জানুয়ারি সোভিয়েত রাশিয়ার প্রচেষ্টায় পাক-ভারত শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই ব্যর্থ যুদ্ধ ও তাসখন্দে সম্পাদিত চুক্তির (যা ইতিহাসে তাসখন্দ-চুক্তি নামে খ্যাত) পর কাশ্মির-সমস্যার গুরুত্ব আরেকবার অন্তরালে নিপতিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হল, রুশ নেতা কোসিগিনের হাতে সৃষ্ট তাসখন্দ ঘোষণা ছিল মূলত সর্বশেষ আন্তর্জাতিক দলিল, যেখানে কাশ্মিরকে বিরোধপূর্ণ এলাকা বলে স্বীকার করা হয়েছে, তাও মাত্র একবার। উপরন্তু এটাও একটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। এখানে বলা হয়েছে যে, Both the leaders afferm their resolve to solve all their disputes in the spirit of the Charter in context the Jammu and Kashmir was discussed. এর পর থেকে কাশ্মির সমস্যাকে নিয়ে "বিরোধপূর্ণ" শব্দের পরিবর্তে বিভিন্ন বিকল্প শব্দের ব্যবহার শুরু হয়। দীর্ঘকাল অবধি ব্যবহৃত "কাশ্মির সমস্যা"-এর পরিবর্তে "পাক–ভারত বিরোধ" (Indo-Pak difference)-এর ব্যবহার হতে থাকে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, একটা জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জাগ্রত আন্দোলনকে সুকৌশলে দুই দেশের সীমান্ত বিবাদ বলে পেশ করা হল। বলা হল, এটা একটা পাক-ভারত সীমান্ত বিরোধ। '৬৫ সালের যুদ্ধের পর পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে নেমে আসে অস্থিরতার ঘনঘটা। দীর্ঘদিনের পুঞ্জিভূত অগণতান্ত্রিক রাজনীতির আচার-আচরণ, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলের প্রতি বৈষম্যমূলক আচার-অত্যাচার-নিপীড়ন ইত্যাদির বিরুদ্ধে এখানে শুরু হয় গণজাগরণ। স্বৈরাচারী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে অপ্রতিরোধ্য গণআন্দোলনের সূচনা হয়। এই গণজোয়ারের মুখে তদানিন্তন স্বৈরশাসক জেনারেল আইউব খান শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করেন আরেক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে। সামরিক স্বৈরাচারের এই সময় পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গন হয়ে ওঠে আরও উত্তপ্ত। পূর্বাঞ্চলের স্বায়ত্বশাসনের ও পরবর্তীতে স্বাধীনতার দাবি পূর্ণ জনসমর্থন লাভ করে। '৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুরু হয় বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা যুদ্ধ।

এমনিতরো সমস্যা-সংকুল ও তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে কাশ্মির সমস্যার প্রতি পাকিস্তান সরকারের আগ্রহ লোপ পাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। বলা বাহুল্য যে, ভারত তার চিরশত্রু পাকিস্তানকে শায়েস্তা করার এই মোক্ষম সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কিঞ্চিৎ কসুর করেনি।

'৭১-এর ডিসেম্বর মাসে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের সামনে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। পাকিস্তানের এহেন রাজনৈতিক ও সামরিক পরাজয় স্বাভাবিক কারণে পাকিস্তানি জনগোষ্ঠির জন্য ছিল অসহনীয় দুর্যোগ। উপরন্তু নব্বই হাজার যুদ্ধবন্দি ভারতের হাতে কয়েদ হওয়া এবং

www.pathagar.com

পাঁচ হাজার বর্গমাইল এলাকা ভারতের কব্জাভূত হওয়ার মত দুর্বিপাক পাকিস্তানকে ভারতের সঙ্গে সিমলা চুক্তির মত অসম চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করে।

এই চুক্তির ভাল-মন্দ উভয় দিকের ওপর পাকিস্তানি সামরিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবীমহলে চরম মত-পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও এ কথা বলা যায় যে, এই চুক্তিতেও হালকা ভাষায় জম্মু কাশ্মির সমস্যার সমাধান এখনও বাকি আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের পর পাকিস্তান ভারতের কাছে একটা দুর্বল রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করে। '৬৬ সালের তাসখন্দ চুক্তির পর কাশ্মিরি জনগণের স্বাধিকার আন্দোলনে যে হতাশার ছন্দ সঞ্চারিত হয়, '৭২-এ খণ্ডিত পাকিস্তান-ভারতের সিমলা চুক্তি স্বাক্ষর সেই হতাশার পরিধি আরও বৃদ্ধি করে। অনেক কাশ্মিরি নেতা ভারতীয় শাসকগোষ্ঠির কাছে মাথা অবনত করেন। ইন্দিরা-আব্দুল্লাহ সমঝোতা চুক্তি তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ১৯৭২ সালের সিমলা চুক্তির পর থেকে বস্তুত পাকিস্তান কাশ্মির সমস্যা সমাধানে সরাসরি কার্যকর কোনও ভূমিকা পালনে ততক্ষণ পর্যন্ত অপারগতার বহিঃপ্রকাশ করেছে, যতক্ষণ পর্যন্ত কাশ্মিরি জনগণ নিজ পায়ে ওঠে না দাঁড়াবে। '৭২ সালের জুলাই মাসে মি. ভুট্টো পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে সিমলা চুক্তির অনুমোদনের ব্যাপারে বক্তৃতা করতে গিয়ে কাশ্মিরি জনগণকেই তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার উৎসাহ প্রদান করে বলেন, "তাঁদের জন্য এই একটাই পথ খোলা রয়েছে"। বাস্তবক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়েছে যে, '৭২ থেকে '৭৭ পর্যন্ত কাশ্মির সমস্যার সমাধানকল্পে পাকিস্তান উল্লেখযোগ্য কোনও ভূমিকা রাখতে পারেনি। পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাই সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরকে "কবরবিদ্ধ কাশ্মির সমস্যার তাবুতে সর্বশেষ খিল" বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়াউল হক পাকিস্তানের ক্ষমতার মসনদে অধিষ্ঠিত হন। এই সামরিক শাসকের আমলেই কাশ্মিব সমস্যাকে হীমাগার থেকে উত্তোলনের প্রচেষ্টা পুনরায় আরম্ভ হয়। তাকে পুনরুজ্জীবন দান করার ক্ষীণ প্রচেষ্টা এই পর্বেই ধীরপদে অগ্রসর হতে থাকে। মানবাধিকার সংস্থার বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বৈঠকে জিয়াউল হক কাশ্মিরের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বিষয় আলোচনাভুক্ত করেন। এতে করে ভারত বারবার তার প্রতিবাদে পূর্ব নির্ধারিত বেশ ক'টি আলোচনা-বৈঠক মুলতবি করে দেয়। জেনারেল জিয়াউল হক সিমলা চুক্তির ভিত্তিতেও কাশ্মির সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা শুরু করে দেন। এবং এই চুক্তি মোতাবেক আলোচনায় বসার জন্য ভারতকে বার বার আমন্ত্রণ জানান। সর্বোপরি সরকারি মাধ্যম ও বিবৃতিতে কাশ্মির প্রসঙ্গ উল্লেখ হতে থাকে।

www.pathagar.com

দিল্লির ক্রীড়নক শেখ পরিবারের সর্বশেষ উত্তরাধিকার ফারুক আব্দুল্লাহ

১৯৯৬ সালের অক্টোবর ডা. ফারুক আব্দুল্লাহ অধিকৃত কাশ্মিরের রাজধানী শ্রীনগরে দিল্লির ক্রীড়নক প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। ইতোপূর্বে তিনি আরও দু'বার নয়াদিল্লির আজ্ঞাবহ হিসাবে এই দায়িত্ব পালন করেছেন। তিন শতাংশ ভোটারের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাপ্ত নির্বাচনী নাটকে তিনি ও তাঁর দল ন্যাশনাল কনফারেন্স সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। কাশ্মির রাজ্যসভার নির্বাচনী প্রহসনে সাতাশি আসনের মধ্যে ফারুক আব্দুল্লাহকে সাতান্ন আসন দেওয়া হয়। বাকি ত্রিশ আসন অন্যান্য ভারতপন্থী দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যেই বন্টন করা হয়। আন্তর্জাতিক প্রচার-মাধ্যম ছাড়াও ভারতীয় প্রেসও এ কথা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এই প্রহসনের নির্বাচনে প্রদত্ত তিন শতাংশ ভোটারও অস্ত্রের মুখে ভোট কেন্দ্রে গমন করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ফারুক আব্দুল্লাহর প্রধান মন্ত্রিত্ব ও সরকার প্রতিষ্ঠা কতটুকুন নৈতিক ও আইনগত এবং গণতান্ত্রিক বৈধতা গ্রহণ করে, এই প্রশ্ন বারবার বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের সামনে ব্যঙ্গ করছে। বেয়নেটের ছায়ায় অনুষ্ঠিত এই নির্বাচন সম্পর্কে রাজ্যের একজন রাজনীতিবিদ অধ্যাপক ভূতীম সিং বলেন যে, "শ্রীনগরের দশটি নির্বাচন কেন্দ্রে একটি ভোটও পড়েনি"। শ্রীনগর শহরের সরকারি কর্মকর্তারা স্বয়ং এ কথা বলেছেন যে, এখানে মাত্র তিন শতাংশ লোক তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। আর যখন ভোট গণনা হয়, তখন ঘোষণা দেওয়া হয় যে, শহরের নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে আটাশ শতাংশ ভোটার ভোট প্রদান করেছে। ৭ অক্টোবর নয়াদিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি যুক্তি প্রমাণ সহকারে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, একটা নির্বাচন-নাটকের প্রয়োজন ছিল, যা বেয়নেটের ছত্র-ছায়ায় অভিনীত হল এবং ফারুক আব্দুল্লাহর মাথায় মুখ্যমন্ত্রিত্বের কণ্টকাকীর্ণ তাজ পরানো হল। ফারুক আব্দুল্লাহ ছাড়া রাজ্যের অন্য কেউ এই কাঁটাভর্তি প্রধানমন্ত্রিত্বের তাজ মাথায় পরিধান করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সত্যি বলতে কী, অধিকৃত কাশ্মিরে স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদি রক্তের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার খান্দানি ঐতিহ্য বহাল রেখে ফারুক আব্দুল্লাহ তৃতীয়বার কাশ্মিরের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন।

ভারত এ যাবৎ জম্মু-কাশ্মিরে নয়বার নির্বাচনী নাটক অভিনীত করেছে। আর অধিকাংশ নাটকে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রেখেছে ন্যাশনাল কনফারেন্স ও শেখ আব্দুল্লাহর পরিবার। প্রথমে শেখ আব্দুল্লাহ ন্যাশনাল কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন। যিনি ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গে বন্ধুত্ব ও রাজ্যের প্রধানমন্ত্রিত্বের বিনিময়ে কাশ্মিরি জনগণের সুদীর্ঘকালীন সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে কসুর করেননি। কংগ্রেস নেতৃত্ব শেখ আব্দুল্লাহকে এই প্রলোভনে আকৃষ্ট করেছিলেন যে, কাশ্মিরকে অভ্যন্তরীণভাবে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে। আর শেখকে করা হবে এই রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। কিন্তু শেখ সাহেব মুখ্যমন্ত্রীর মসনদে সমাসীন হয়ে যেইমাত্র প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রয়োগ করার

www.pathagar.com

দুঃসাহস প্রদর্শন করেন আর জওহরলাল নেহেরুকে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের কৃত প্রতিশ্রুতি পালনের দাবি করেন, তখনই প্রিয় বন্ধুর আসল রূপ প্রকাশ পায়। অচিরেই শেখ আব্দুল্লাহকে দীর্ঘদিনের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এই দীর্ঘ কারাবাসকালীন মি. নেহেরু ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শেখ সাহেবের 'ব্রেইন ওয়াশের' দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অবশেষে তিনি ভারতের পূর্ণ আধিপত্য মেনে নিয়ে কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকেও পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পুনরায় মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষমতাহীন পদ অলংকৃত করেন। এবার তিনি জওহরলাল নেহেরুর দূত হিসাবে পাকিস্তানে আড়ম্বরপূর্ণ এক সফরে গমন করেন, যাতে তাঁর বিচ্যুতির প্রতি পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দেরও সমর্থন আদায় করা যায়। কিন্তু বিধি বাম, ইতোমধ্যেই নেহেরুর মৃত্যু সংবাদে তিনি অসম্পূর্ণ মিশন রেখে দিল্লি ফিরে আসেন। তার বিনিময়ে অধিকৃত রাজ্যের শাসন-কর্তৃত্ব শেখ পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ভারতের শাসনতন্ত্রে অধিকৃত কাশ্মিরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানের যে ধারা পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল, তাও বাতিল হয়ে গেলে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর স্থলে অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মর্যাদায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আর তিনি জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত নয়াদিল্লির হাতের পুতুল হয়ে থাকেন। শেখ আব্দুল্লাহর তিরোধানের পর ফারুক আব্দুল্লাহ পিতৃপদে অলংকৃত হন। দিল্লির বিশ্বস্ত বশংবদ হিসাবে তিনি পিতা শেখ আব্দুল্লাহকেও অতিক্রম করে যান।

১৯৮৭ সালে প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে যখন ডা. ফারুক দ্বিতীয়বার উজিরে আ'লা হন, তখন থেকেই কাশ্মিরে বর্তমান সশস্ত্র জিহাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন হয়। তখনও ভোটারবিহীন নির্বাচনে অনুপস্থিত থেকে জনগণ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, চূড়ান্ত ও সর্বশেষ সংগ্রাম পর্যায় সমুপস্থিত। জনগণ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব বাস্তবায়ন তথা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ছাড়া অন্য কোন নির্বাচনী নাটক সহ্য করবে না। সে সময়কার রাজ্য গবর্নর জগমোহন এক প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধিকে লিখেন, "এবার আমরা নির্বাচন তো জিতলাম, কিন্তু কাশ্মির হাতছাড়া করলাম।" ১৯৮৯ সালের প্রথম দিকে যখন কাশ্মিরে সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে, তখন থেকে শেখ পরিবারের জন্য রাজ্যের কোথাও নিরাপদ জায়গা বাকি থাকল না। নয়াদিল্লিতেই তিনি আশ্রয় নিতে বাধ্য হলেন। এদিকে শেষ পর্যন্ত ১৯৭০ সালের শেষ লগ্নে বশংবদ রাজ্যসভাও ভেঙ্গে দিয়ে দিল্লি সরকার সেখানে গবর্নর শাসন চালু করে দেয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্র মোতাবেক কোন রাজ্যে ছয়মাসের অধিককাল গবর্নর শাসন চলতে পারে না। মেয়াদ বৃদ্ধি চলতে চলতে যখন প্রজাতন্ত্রের সংবিধানও রক্ষা করা যাচ্ছে না, তখনই পুনরায় প্রহসনমূলক নির্বাচনের নাটক মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়। যাতে করে একটি তাবেদার রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব জনমতকে পুনরায় ধোঁকা দেওয়া যায়। সুতরাং এবারও দিল্লির শুভদৃষ্টি নিপতিত হয় শেখ পরিবারের ওপর। এই উপমহাদেশে বিশ্বাসঘাতকতার ক্রম নির্ধারণে আজকাল এই শেখ পরিবারকে তৃতীয় নম্বরে স্থান দেয়া হয়। অর্থাৎ মীরজাফর, মীর সাদেকের পর। শেখ আব্দুল্লাহ মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণ করেই ঘোষণা করেন, কাশ্মিরে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিপাত করেই তিনি ক্ষান্ত হবেন। একজন আজ্ঞাবহ নিমক হারামের এ কথাই বলা সাজে। কিন্তু যে কাজ ভারত তার অফুরন্ত

www.pathagar.com

উপায়-উপাদান, তাবেদার বশংবদের প্রশস্ত নেটওয়ার্ক আর সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী দিয়ে সম্পন্ন করতে পারছে না, ফারুক আব্দুল্লাহর মত জ্বলিত কার্তুজের খোসা দিয়ে কী হবে– বিবেচনার বিষয়ই বটে। হ্যাঁ, একটা কাজ অবশ্যই হবে। আর তা, ভারতীয় দখলদার বাহিনী যতদিন থাকবে, ততদিন কাশ্মির সকল প্রকার জোর-জুলুম, নির্যাতন-উৎপীড়নের দায়-দায়িত্ব ফারুক ও তাঁর সরকারের ওপরই ন্যস্ত করবে। সর্বপ্রকার কলঙ্ক তিলক তাঁরই কপালে এঁকে দেবে। পরিকল্পনা ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। ফারুক আব্দুল্লাহ তাঁর নিজের গ্রাম "সায়াদা" থেকেই সূচনা করেন ফৌজি কার্যক্রম। সম্ভবত এটাই জাতিদ্রোহীদের ভাগ্যলিপি।

অতি সম্প্রতি জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভারতের একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মি. নরেন্দ্র শর্মা কাশ্মির বিষয়ের ওপর মন্তব্য করে বলেছেন, "কাশ্মিরি জনগণের ওপর ফারুক আব্দুল্লাহর মত লোকদের চেপে দেওয়ায় অশুভ পরিণতি ভারতকেই ভোগ করতে হবে। ভারতীয় নেতৃত্ব সম্ভবত এখনও এটা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ইতোমধ্যে মি. ফারুক সাত লক্ষ সেনা সদস্যের উপস্থিতির পরও আরও অধিক পরিমাণ প্যারামিলিটারি প্রেরণের জন্য আবেদন করেছেন। সেখানে বর্তমান অবস্থা এমন যে, বিগত নির্বাচনে পরাজিত ব্যক্তিরা ফৌজি ক্যাম্পের বাইরে আসতে সাহস পাচ্ছেন না। আর ভারতীয় এজেন্সিগুলোও তাঁদের জন্য নিরাপত্তা দিতে পারছে না। ফারুক আব্দুল্লাহর জন্য পিতা শেখ আব্দুল্লাহর জীবনেও কম শিক্ষণীয় বিষয় ছিল না। মৃত্যুর পূর্বে তিনি অনুশোচনায় ভুগেছেন যথেষ্ট। মৃত্যুর পর তাঁর কবরকে গণরোষ থেকে বাঁচানোর জন্য সেনাবাহিনীর লোক রাখতে হয়েছে পাহারায়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আব্দল্লাহ-পরিবারের জন্য অধিকৃত কাশ্মির রাজ্যের শাসন-ক্ষমতার মেয়াদ পূর্ণ নাও হতে পারে। আফগানিস্তানের নজিবুল্লাহকেও তাঁর প্রভুরা রক্ষা করতে আসেননি। নজিবুল্লাহ, আব্দুল্লাহদের পর স্বাধীনতার উদীয়মান লাল সূর্য আর কেউ ঠেকাতে পারবে না।

www.pathagar.com

চলমান আন্দোলনের পটভূমি

রক্তরাঙা সংগ্রামের অমীমাংসিত উত্তরাধিকার কাশ্মিরি মুসলিম জনগোষ্ঠি দীর্ঘ দুই শতাব্দি অবধি হিন্দু সম্প্রদায়ের জুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে আসছে। দারিদ্র, সন্ত্রাস, অত্যাচার, অবিচার ও শত উৎপীড়ন সত্ত্বেও এই উপত্যকার জনগণের চিন্তা-চেতনা থেকে ইসলামি আদর্শের বিলোপ ঘটেনি। শত দুর্যোগ-দুর্বিপাক, দুঃসময় ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের পরও তাদের সমাজ-সংস্কৃতি ও মানসপটে ইসলামি জীবন-দর্শন সক্রিয় ও উজ্জীবিত থেকেছে। ১৯৪৭ থেকে অদ্যাবধি ভারতীয় শাসকশ্রেণী কাশ্মিরি মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিলীন করার চেষ্টা-তদবির করে আসছে, যাতে করে তাদের স্বতন্ত্র জাতিসত্তা বিলুপ্ত হয়ে অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তার সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। কাশ্মিরি সচেতন মুসলিম যুবসমাজে যখন এই উপলব্ধি জাগ্রত হয়ে ওঠে যে, ভারত অবলিলাক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও জাতীয়তার অন্তরালে তাদেরকে ইসলামি আদর্শচেতনা থেকে দূরে সরানোর প্রয়াস পাচ্ছে, তখনই তারা আরও অধিকতর ইসলামের দিকে আগ্রহী হয়ে ওঠতে থাকে। মুসলিম যুবসমাজের ইসলামের প্রতি এই আকুতি ও আকর্ষণদৃষ্টে গোঁড়া হিন্দু শাসকগোষ্ঠি আরও অধিক পরিমাণে ইসলাম-বিরোধিতা প্রদর্শন করতে থাকে। ফলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, যুবসমাজের নিজস্ব তাহজিব-তামাদ্দুন ও ইসলামি আদর্শ সচেতনতা অধিকতর দৃঢ় হতে থাকে। ইসলামি আদর্শ-চেতনা যেহেতু কখনও পরাধীন জীবন-যাপন মেনে নিতে পারে না, সেহেতু ইসলামি জীবনীশক্তি সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুবসমাজের মধ্যে জিহাদি চেতনাও সমৃদ্ধ হতে থাকে। এই সমৃদ্ধ চেতনাশক্তিই কাশ্মিরি জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রেরণার সঞ্চার করছে। মূলত ইসলামি জীবনাদর্শ ও দর্শনই কাশ্মিরি জনগণের অবিতর্কিত স্বাধীনতার মূল চেতনা। বলা হচ্ছে, মুসলিম ও ইসলামি জীবনদর্শনের ভিত্তিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। এর চাইতে বরং মানবাধিকারের ভিত্তিতেই এই আন্দোলন পরিচালিত হওয়া উচিত। নচেৎ এই আন্দোলনকে ইসলামি মৌলবাদী চিন্তা ও গোঁড়ামীর দোষে দুষ্ট আখ্যা দেওয়া হবে। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, ইহুদি কিংবা খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী যদি আজাদি দাবি করে, তা তাদের অধিকার বলে স্বীকৃত হবে। কিন্তু মুসলিম হয়ে যদি স্বাধীনতা চাওয়া হয়, তা হবে উগ্রবাদ ও গোঁড়ামির ফলশ্রুতি। অর্থাৎ মুসলমান হয়ে তার জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার দাবি করা যাবে না। জর্জিয়া, রুমানিয়া ও পূর্ব-তিমুর যদি স্বাধীনতা দাবি করে, তা হয় উদার চিন্তার ফসল; আর বসনিয়া, চেচনিয়া, কসভো ও কাশ্মিরি মুসলমানরা আজাদি চাইলে তা হয় ইসলামি গোঁড়ামী ও ধর্মীয় কুপমণ্ডুকতার পরিচায়ক!

বস্তুত ইসলামের প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসার ফলশ্রুতি হল, ভারত যতই কঠোরতা অবলম্বন করেছে, জনগণের মধ্যে তত বেশি পরাধীনতার শৃঙ্খল-মুক্তির প্রেরণা বৃদ্ধি পেয়েছে। জনগণের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আন্দোলন স্বাধীনতা ও মুক্তি সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করার পেছনে ইসলামি চেতনাই সক্রিয়– এতে কোন সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

www.pathagar.com

সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে কাশ্মির সমস্যা নিয়ে পাকিস্তানের তদানিন্তন সরকারি পর্যায়ের শীতল দৃষ্টিভঙ্গির ফলে অধিকৃত কাশ্মিরের ভারতপন্থী নেতৃবৃন্দ ব্যক্তি ও গোষ্ঠি-স্বার্থের প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে মুসলিম যুবমানসে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কারও দয়ার দানে স্বাধীনতা আসবে না, বরং নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। তাদের জন্য এই সিদ্ধান্তে আসা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল যে, তাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ভারতীয় গোলামির শৃঙ্খল ছিন্ন করতে পারবেন না। আর পাকিস্তান? দুর্বল পাকিস্তান তার দৃষ্টি আগেই ফিরিয়ে নিয়েছে। সিমলা চুক্তির অন্যতম ধারায় বলা হয়েছে, ভারত ও পাকিস্তান পরস্পর ঐকমত্যের ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করবে। এই অস্পষ্ট ধারায় প্রত্যেক পক্ষের হাতেই ভেটো করার সুযোগ সদা-সর্বদাই বিদ্যমান থাকছে। উভয়পক্ষ যে-কোন সময় সিদ্ধান্তে না পৌঁছেই আলোচনা বৈঠক থেকে উঠে চলে যাবে। বাস্তব অভিজ্ঞতাও এই সত্য প্রমাণ করে। এই যাবৎ পাক-ভারত আলোচনা সমস্যার সমাধান দূরের কথা, মূল সমস্যার সমাধান নির্ধারণের প্রারম্ভ পর্যন্তও পৌঁছতে পারেনি। কথায় বলে, নাশাচতাম, গোফতম, খোর্দাম ওয়া বরখাস্তম; বৈঠক করেছি, আলোচনা করেছি, ভক্ষণ করে বিদায় নিয়েছি। এ কারণে কাশ্মিরি যুবগোষ্ঠি নিজেদের স্বাধীনতার সংগ্রাম নিজেরাই লড়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বর্তমান কাশ্মির স্বাধীনতা আন্দোলনে একক কোন নেতৃত্বের অবস্থান নেই। অধিকৃত কাশ্মিরে সেইসব ব্যক্তি ও নেতৃত্বকেই সম্মান ও মর্যাদার চোখে দেখা হয়, যাঁরা মাথায় কাফন পরিধান করে আন্দোলনের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এই আন্দোলনে একক ও মোহগ্রস্ত নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতি বাহ্যত আশ্চর্য মনে হবে। মূলত জিহাদের মন্ত্রে উজ্জীবিত শাহাদাতের অদম্য আগ্রহ ও প্রেরণায় দিন দিন এ আন্দোলন প্রসার লাভ করছে।

সাধারণত হিন্দু-মানসিকতা ও তাদের প্রকৃতি অন্য ধর্মাবলম্বীদের গ্রহণ করতে পারে না। ভিন্ন ধর্মের লোকদের সঙ্গে সামাজিকভাবে পরস্পর সহাবস্থান হিন্দু-প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এ ব্যাপারে The dangers of Hindu imperialism নামক গ্রন্থের ২৫২ পৃষ্ঠায় S.D.G মহারাজ বলেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক একাকিত্ব, অসহিষ্ণুতা ও বিচ্ছিন্নতায় হিন্দু-মানসিকতার কোন দৃষ্টান্ত নেই। অপেক্ষাকৃত কম সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করতে তারা নারাজ। শুধু মুসলিম নয়, বরং যে-কোন অহিন্দুর জন্য এটা অমর্যাদার কারণ। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে চিন্তা করলে জানা যায় যে, হিন্দু সমাজব্যবস্থা আজাদি, ঐক্য ও শান্তির পথে বড় বাধা। হিন্দু সম্প্রদায়ের এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসহিষ্ণুতা ও বিচ্ছিন্নপ্রিয় মানসিকতাই বিভক্তির সময় সন্ত্রাস সম্ভ্রমহানিকে সরকারি ব্যবস্থার বুনিয়াদ বানিয়েছিল। একজন দায়িত্বশীল ইংরেজ অফিসার পার্টিশনের সময়কার বিভিন্ন ঘটনায় বিশেষ করে গডমক্তশির এলাকার অবস্থা বর্ণনা করেত গিয়ে বলেন, প্রায় সব মুসলমান নারী-পুরুষকে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। গর্ভবতী জননীদের উদর বিদীর্ণ করে বাচ্চাদের টুকরো টুকরো করা হয়। পাথরের সঙ্গে মাথা ঠুকে ঠুকে ছিন্নভিন্ন করা হয়। এ সময় অত্যাচারীদের স্ত্রী-পরিজনরা পাশে দাঁড়িয়ে অট্টহাসি হাসতে থাকে।

www.pathagar.com

মহিলাদের সম্ভ্রমহানির ঘটনাও প্রকাশ্যে চলতে থাকে। পরিশেষে এই লোমহর্ষক হত্যাযজ্ঞ ও অমানবিক অত্যাচারের পরিসমাপ্তি তখনই ঘটে, যখন অত্যাচার করার জন্য আর কোনও মুসলিম নারী-পুরুষ অবশিষ্ট থাকেনি। ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতে, জুলুম-পীড়নের এই লীলাখেলা হিন্দুস্থান থেকে মুসলিম অস্তিত্ব বিলীন করার ঐক্যবদ্ধ হিন্দু মানসিকতারই প্রয়াস ছিল। সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের ভূমিকা বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা আজাদ বলেন, "আমরা মি. প্যাটেলের অনুভূতি প্রত্যক্ষ করে অবাক হয়ে যাই যে, এমন সময় যখন দিল্লিতে মুসলিম হত্যাযজ্ঞ প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত হচ্ছিল, মি. প্যাটেল তখন অত্যন্ত শান্তশিষ্টভাবে গান্ধিকে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলাল নেহেরুর তার সরকারের পলিসির সঙ্গে দ্বিমত পোষণ না করাই উচিত।" অর্থাৎ সবকিছু কংগ্রেস সরকারের সম্মতিতেই চলছিল। আর কংগ্রেস সভাপতি আজাদ সাহেব ছিলেন এ ব্যাপারে অজ্ঞ। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, বর্তমান কাশ্মির রাজ্যে যে-সব অত্যাচার-অবিচার, হত্যা-ধর্ষণযজ্ঞ চলছে, তা হিন্দু মানসিকতার বিপরীত কিছুই নয় বরং পরিপূরক। হিন্দু মানসিকতার সঙ্গে পরিচিত কাশ্মিরি জনগোষ্ঠি তাই আজ জিহাদি জীবন অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে।

কাশ্মির রাজ্যের মুক্তি সংগ্রাম আজ যে পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, এটা নিছক কোন সামরিক ঘটনাপ্রবাহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নয়। নয় কোন স্থূল আবেগী কার্যক্রমের পরিণতি। এই মুক্তি সংগ্রামের পশ্চাতে রয়েছে সুদীর্ঘ চার দশকের সুচিন্তিত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও পরিকল্পনা, যা কাশ্মিরের স্বাধীনতা-সংগ্রামী রাজনৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশেও আঞ্জাম দিয়েছেন। আমাদের আগের বক্তব্যে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ বেনিয়াদের চক্রান্ত ও হিন্দু কংগ্রেস নেতৃত্বের শঠতার বিষময় ফসল আজকের কাশ্মির সমস্যা। কাশ্মিরের তদানিন্তন রাজা হরি সিং ডোগরা, গবর্নর জেনারেল লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন এবং পণ্ডিত নেহেরুর ত্রিপক্ষীয় চক্রান্তের ফলে কাশ্মিরি জনগণের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটে। উপমহাদেশের স্বরাজ অর্জনের এই সন্ধিক্ষণে কাশ্মিরের ললাটে এঁটে দেয়া হয় এক সুকঠিন গোলামির পদচিহ্ন। সেই থেকে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ও সূক্ষ্ম কূটনৈতিক চক্রান্তের মাধ্যমে কাশ্মিরের ওপর ভারতীয় আগ্রাসন চলতে থাকে। ভারত কাশ্মির রাজ্যে তার তাবেদার নেতৃত্ব জেঁকে দেয় স্বাধীনতার আচ্ছাদন পরিয়ে। যার মধ্যে শেখ আবদুল্লাহই অন্যতম প্রধান ছিলেন। নিঃসন্দেহে মহারাজার বিরুদ্ধে মুসলমান জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করার ক্ষেত্রে শেখ আবদুল্লাহর ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে। এই অবদানের ফলে তিনি কাশ্মিরি জনগণের শিরোমণিতে পরিণত হন। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তখন থেকে এ কথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, শেখ আবদুল্লাহর চূড়ান্ত লক্ষ্য আজাদি নয়; স্থায়ী গোলামির পথ, চক্রান্তের পথ। তিনি 'শের-এ কাশ্মিরের' রূপে একজন ক্ষমতালোভী ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হয়েছেন। কাশ্মিরের স্বাধীনতার প্রতি তিনি কখনও আন্তরিক ছিলেন না। ১৯৪৬ সালে 'কাশ্মির ছাড়' আন্দোলনের সময় মহারাজা হরি সিং -এর কাছে তাঁর লিখিত চিঠি এ কথাই প্রমাণ করে যে, তিনি মূলত ক্ষমতার পূজারি ছিলেন।

www.pathagar.com

কাশ্মির আলাদা রাষ্ট্র হউক, এটা তিনি মোটেও চাইতেন না। ফলে স্বাধীনতা ও ইসলামপ্রিয় দূরদর্শী নেতৃত্ব স্পষ্ট বুঝতে পারেন যে, কাশ্মিরে স্বাধীনতার জন্য শেখ আব্দুল্লাহর আসল চেহারা উন্মোচন করা অপরিহার্য। অপরিহার্য তার ক্ষমতালিপ্সু ও স্বার্থান্বেষী রূপ জনগণের কাছে প্রকাশ করা। সুতরাং এ কাজে সেখানকার স্বাধীনতা ও ইসলামপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

রাজনৈতিক ময়দানে তাই শেখ আব্দুল্লাহকে প্রথমবারের মত কাশ্মির জামায়াতে ইসলামীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। জামায়াতে ইসলামী শেখ সাহেবের বিরুদ্ধে নির্বাচনী প্রার্থী দিয়ে তাঁর নেতৃত্বের ভোজবাজি ছিন্ন করার প্রয়াস পায়। যদিও জামায়াতে ইসলামী এ কথা বিশ্বাস করত যে, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত স্বাধীনতার লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়। অবশ্য এর মাধ্যমে জনমতের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ এবং ন্যায়-অন্যায় ও ভাল-মন্দ পার্থক্য করার কাজ সহজ হয়ে ওঠবে। সুতরাং সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জামায়াতের প্রচেষ্টায় এই ফল আসে যে, যে কাশ্মির এসেম্বলিতে শেখ সাহেবের উপস্থিতিতে স্বাধীনতার পক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করা যেত না, সেই কাশ্মির পার্লামেন্টে জামায়াত নেতা সাঈদ আলী গিলানি প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন যে, "কাশ্মির রাজ্যের অবস্থান এখনও বিতর্কিত। জাতিসংঘের প্রস্তাবানুযায়ী জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদান করতে হবে।" ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনের এই অগ্নিপুরুষ ও তাঁর সাথীদেরকে বছরের পর বছর শেখ আব্দুল্লাহর কারাগারে নির্যাতন ভোগ করতে হয়। সাঈদ গিলানি, শাব্বির আহমদ শাহ, ফারুক রহমানি, আশরাফ সাহরাঈ, গোলাম আহমদ আহরার এবং আজম ইনকিলাবির মত অকুতোভয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা আন্দোলনের কারণে সতেরো বছর শেখ আব্দুল্লাহর কারাগারে জীবন কাটাতে বাধ্য হন। এমনিভাবে আজাদি সংগ্রামের এই দৃঢ়চেতা কাফেলা শত বাধা-বিপত্তি ও অত্যাচার-নির্যাতন সহ্য করে অগ্রসর হতে থাকে। অবশেষে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, প্রকৃতই শেখ সাহেবের পথ ছিল ধ্বংস ও পরাধীনতার পথ। সুতরাং আজ কাশ্মিরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এ কথা বিশ্বাস করে যে, কাশ্মির রাজ্যের গোলামির জন্য শেখ সাহেব সবচাইতে বেশি দায়ী। সেখানে আজ অবস্থা এই যে, শেখ আব্দুল্লাহর কবর পাহারা দেওয়ার জন্য নয়াদিল্লিকে সশস্ত্র পাহারাদার মোতায়েন করতে হয়েছে। আর শেখ পরিবারের জন্য উপত্যকার মাটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

মরহুম শেখ আব্দুল্লাহর প্রকৃত স্বরূপ নগ্নভাবে প্রকাশ পায় তখন, যখন তিনি মৃত্যুর পূর্বে যোগ্য ব্যক্তিদের পরিবর্তে রাজনীতিতে অযোগ্য স্বপুত্র ফারুক আব্দুল্লাহকে ক্ষমতার উত্তরাধিকার ঘোষণা করেন। শেখ সাহেবের এই ঘোষণায় এই ধারণা আরও দৃঢ়মূল হয় যে, হরি সিং-এর খান্দানি গদিতে শেখ খান্দানের অবস্থান বৈ আর কিছুই পরিবর্তন হয়নি। যদি গদিনশিন হওয়ার ক্রমধারাই চলতে থাকে, তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে এত রক্তক্ষয় হওয়ার কী প্রয়োজন ছিল। সুতরাং এমনিভাবেই পরিবেশ পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে থাকে। ব্যক্তি কারিশমা ছিন্ন হতে শুরু করে। জনগণ প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করতে পারে। জনমতের ওপর তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত

www.pathagar.com

হয়। প্রকৃত স্বাধীনতাকামী নেতৃত্বের উৎসাহ-উদ্দীপনায় প্রবল প্রাণের সঞ্চার হয়। সমসাময়িককালে হিমালয়ান উপমহাদেশ ও তার আশপাশে কিছু অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়। মানব-সমাজে বিনা কার্যকারণে যেমন কোনও ঘটনা সংঘটিত হয় না, তেমনি সংঘটিত ঘটনাও সমসাময়িক সমাজে কোনও না কোনও প্রভাব বিস্তার না করে ছাড়ে না। কাশ্মিরের প্রখ্যাত স্বাধীনতাকামী নেতা মকবুল বাটের মৃত্যুদণ্ড এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। ভারত সরকার একজন পুলিশ হত্যার অভিযোগে মুক্তিযোদ্ধা মকবুল বাটকে তেহার জেলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করলে কাশ্মিরি জনগণের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইতোমধ্যেই সংঘটিত হয় ইরান বিপ্লব। এই বিপ্লবের কিছু কিছু দিক নিয়ে কিছু ভিন্নমত থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য সত্য যে, এই বিপ্লবের প্রভাব পড়েছে সারা দুনিয়ায়। বিশেষ করে, সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশে আবদ্ধ জাতিসমূহ যারপরনাই উৎসাহ পেয়েছে। এবং প্রমাণ হয়েছে যে, কোনও জাতি যখন ঐক্যবদ্ধভাবে ওঠে দাঁড়ায়, রুখে যায়, তখন আমেরিকার মত সুপার পাওয়ারও হার মানতে বাধ্য হয়। এমনিতরো এক পরিস্থিতিতে ১৯৮০ সালে কাশ্মির ইসলামি জমিয়তে তালাবা কাশ্মির সমস্যার ওপর এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ইসলামি আন্দোলনের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের দাওয়াত প্রদান করা হয়। সম্মেলনের ঘোষণা কাশ্মির রাজ্যের মুসলিম জনগোষ্ঠির প্রাণে নবপ্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। জনগণের বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভারতের তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি দারুণভাবে অস্বস্তিবোধ করেন। এবং শ্রীনগর বিমান বন্দর থেকেই সম্মানিত মেহমানদেরকে সম্মেলনে অংশগ্রহণ ছাড়াই ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং সম্মেলন অনুষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। ১৯৭১ সালের পর প্রথমবারের মত কাশ্মিরের অভ্যন্তরে একটা দৃঢ় আওয়াজ উত্থিত হয়, যা বিশ্ব জনমতকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে।

এই সময়ই সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া মুসলিম দেশ আফগানিস্তানে আগ্রাসন পরিচালনা করে। একদিকে ইরানের মাটিতে এক বৃহৎ শক্তি আমেরিকা পিছু হটতে বাধ্য হয়, অন্য দিকে আরেক বৃহৎ শক্তি রাশিয়া আফগানিস্তানে আগ্রাসন চালায়। পাশাপাশি দুই মুসলিম রাষ্ট্রে উভয় বৃহৎ শক্তির অবস্থানকে অতি নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন কাশ্মিরের স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দ। তাঁরা দেখলেন, আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন আর কাশ্মিরে ভারতীয় আগ্রাসনের মধ্যে শুধু স্থান-কালের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনও পার্থক্য নেই। কাশ্মিরের যুব সম্প্রদায় যেখানে ইরানের ইসলামি বিপ্লবের প্রভাবে দারুণ প্রভাবিত হয়, সেখানে আফগানিস্তানের অবস্থার দিকেও সচেতন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। তাঁরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন যে, এই আগ্রাসনের সর্বশেষ অবস্থা কোন দিকে মোড় নেয়। অবস্থার পরিবর্তনে এই আন্দোলন যতই বিজয়ের দিকে অগ্রসর হতে থাকে, ততই তাঁরা উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করতে থাকেন। তাঁদের সাহস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি সোভিয়েত রাশিয়া যখন আফগান মাটিতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে আফগানিস্তানে নির্লজ্জ পরাজয়

www.pathagar.com

বরণ করে সেখান থেকে তার সামরিকবাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে, তখন কাশ্মিরি যুবসম্প্রদায় বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পূর্ণোদ্যমে এ্যাকশন শুরু করে দেয়। বস্তুত আফগান মুজাহিদরা পৃথিবীর বহু স্থানে সাম্রাজ্যবাদের যাতাকলে পিষ্ট জাতি, বিশেষ করে মুসলিম স্বাধীনতা-সংগ্রামীদেরকে সীমাহীন প্রেরণা দিয়েছেন, শ্রান্ত-অবসন্ন কাফেলাগুলোকে পুনরায় লক্ষ্যপানে ধাবিত করেছেন।

১৯৮৫ সালে আরও একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মির আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সময় ভারত-সফররত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমের একটা ম্যাচ শ্রীনগর শহরে অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। ম্যাচ অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সাঈদ আলী গিলানি সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন যে, "যেহেতু কাশ্মির একটা বিতর্কিত রাজ্য এবং ভারতের অংশ নয়, কাজেই এখানে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারে না। এই ম্যাচ অনুষ্ঠান বাতিল করা হউক"। প্রথমে এই বিবৃতির ওপর তেমন কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ঠিক খেলা শুরু হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে সাঈদ গিলানি মাঠে উপস্থিত হলে গোটা জনসমুদ্র তাঁর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং ক্রিকেট টিমগুলো মাঠ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে গিলানিকে সরকার গ্রেপ্তার করলে গোটা উপত্যকার জনগোষ্ঠি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। একের পর এক বিক্ষোভ মিছিলে কাশ্মির রাজ্যের ভারতমুক্তির পক্ষে মুহূর্মুহু শ্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে। এভাবে অধিকৃত কাশ্মির এলাকার স্বাধীনতাপ্রিয় জনগণ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিক্ষোভ, প্রতিরোধ-সংগ্রাম চলতে থাকে হাজারো অবর্ণনীয় নিপীড়নের মুখেও। বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মিকে জেলে ঢুকিয়ে সীমাহীন নির্যাতন চালানো হয়। দিল্লি সরকারের দমননীতি, ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও বীভৎস নারী নির্যাতনের পরও মুসলমানদের আজাদির লড়াই অপ্রতিরোধ্য আকার ধারণ করে। ইত্যবসরে সংগ্রামী রাজনৈতিক দলসমূহ এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। কংগ্রেসপন্থী ন্যাশনাল কনফারেন্স ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দল যাবতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতবিরোধ ভুলে গিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক প্লাটফরম তৈরি করতে সক্ষম হয়। মুসলিম ঐক্যফ্রন্ট নামের এই মোর্চা জাতিসংঘের প্রস্তাবানুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার দৃঢ় ঘোষণা প্রদান করে। এবং ১৯৫২ সালে শেখ আব্দুল্লাহর নেতৃত্বে তথাকথিত কাশ্মির পার্লামেন্টে হরি সিং-এর অবৈধ ভারতভুক্তিকে বৈধতা দিয়ে যে প্রস্তাব পাশ করা হয়, সেই প্রস্তাবকে অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে। এতে মুসলিম ঐক্য ফ্রন্টের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বি রূপ নেয়। মূলত এই ফ্রন্ট জনগণকে রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ, অধিকার সচেতনতা ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফ্রন্ট নেতা সাঈদ আলী গিলানির জনপ্রিয়তা শেখ আব্দুল্লাহর অতীত জনপ্রিয়তাকেও অতিক্রম করে যায়। ১৯৮৭ সালের নির্বাচনে এই ঐক্য ফ্রন্ট এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। স্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছিল যে, কারচুপিমুক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ফ্রন্ট অধিকাংশ আসনেই জয় লাভ করবে। ফ্রন্টের জনপ্রিয়তা ও কার্যক্রমে দিল্লি সরকার দারুণভাবে ভীত হয়ে ওঠে। ফলে সরকার যে কোন কিছুর বিনিময়ে ফ্রন্টের সম্ভাব্য বিজয় রুখতে বদ্ধপরিকর হল। তাঁরা বুঝতে পারছিলেন যে, ফ্রন্টের এই অগ্রগতি রোধ না করতে পারলে কাশ্মির রাজ্যের বিচ্ছিন্নতা রোধ করা যাবে

www.pathagar.com

না। সুতরাং নির্বাচনের পূর্বলগ্নে সকল জাতীয় নেতাকে কারাগারে প্রেরণ করা হল। ফ্রন্টের প্রার্থী এবং বাঘা বাঘা কর্মিদের নির্যাতন-সেলে আটক রেখে ইন্টারোগেশনের নামে অমানবিক অত্যাচার-অবিচার চালানো হয়। গোটা উপত্যকায় ভয়-ভীতি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে ফ্রন্টের পক্ষে ভোট প্রদানের পথে চরম বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি করা হয়। শতবাধা-বিপত্তি ও সরকারি সন্ত্রাসের মুখেও জনগণ ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ফ্রন্টের পক্ষে রায় প্রদান করে। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হলে দেখা যায়, ইতিহাসের জঘন্যতম ও নির্লজ্জ মিডিয়া-কৃ'র মাধ্যমে সরকারি প্রার্থীকেই নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনকালে যে সব নেতা-কর্মি জেলের বাইরে ছিলেন, ফলাফল ঘোষণার পরপর বিক্ষোভ প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আশংকায় তাদেরকেও জেলে বন্দি করা হল। কারাগারে এমন বিষক্রিয়াসম্পন্ন খাদ্য বন্দিদের পরিবেশন করা হয় যে, আদালতের রায়ে যখন তাঁরা মুক্ত হলেন, দেখা গেল, সুস্থ সবল মানুষগুলো দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। কারও আঁত বিনষ্ট তো কারও হার্ট বিকল। কারও চোখের জ্যোতি নষ্ট তো কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত। অনেকের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে পড়ে। বস্তুত ১৯৮০-এর দশকে কাশ্মিরি জনগণের প্রাণে আশা-আকাঙ্ক্ষার নব দিগন্তের সূচনা ঘটে। আফগান মুজাহিদরা সোভিয়েত সাম্রাজ্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ শিরকে অবনত করে কাশ্মিরি জনগণের অন্তরে সুপ্ত আজাদি-চেতনাকে পুনরুজ্জীবন দান করেন। একটা বৃহৎ শক্তি যদি পশ্চাতপদ ও দরিদ্র জাতির জেহাদি চেতনার সম্মুখে অবনত হতে বাধ্য হয়, তাহলে ভারতের মত মিনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কেন কাশ্মিরি জনগণের জেহাদি চেতনার সম্মুখে অবনত হবে না। এ তো কোনও বৃহদ শক্তিও নয়। সোভিয়েত সাম্রাজ্যের মত বৃহদ শক্তি দীর্ঘ একযুগ ধরে আফগানিস্তানে হাত-পা মেরেও পর্যুদস্ত হল কী কারণে? কাশ্মিরের ওপর গভীর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে, ভারতের গবেষণা বিভাগ এই বিষয়টার ওপর দৃষ্টিপাত করতে ব্যর্থ হচ্ছে যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের বিপর্যয়ের কারণ কী। এই একটা বিষয়কে সামনে রেখে কাশ্মিরের স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, বর্তমানে এই উপত্যকায় আগ্রাসী ভারতীয় বাহিনীর সামরিক প্রাধান্য ছাড়া অন্য কোনও প্রাধান্য নেই। অস্ত্র দিয়ে অস্ত্র শক্তিকে পরাজিত করা যেতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা আর জিহাদের মন্ত্রে দীক্ষিত চেতনাকে পরাভূত করা যায় না। জিহাদ এবং একমাত্র জিহাদি চেতনাই আজ কাশ্মিরের অলি-গলি, রাজপথে সক্রিয়। মুসলমানের জিহাদি চেতনা পুষ্প-উদ্যানের এমন এক সুঘ্রাণ, যার বিকাশ ও প্রকাশ অপ্রতিরোধ্য। মুসলিম জাতির এটাই আসল সম্পদ। আজকের কাশ্মিরের জনগণ এই সম্পদের বলে বলীয়ান। ৫ জানুয়ারি, ১৯৯০-এ শ্রীনগর বাজারে ভারতীয় সৈন্যরা যখন গুলি চালাচ্ছিল, এ সময় একজন যুবক এসে গুলির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আপন ভাইদের রক্ষা করেন। আর ২৮টি গুলি তাঁর বক্ষ বিদ্ধ করে। এই মর্মান্তিক ঘটনা ইসলামের সেই প্রাথমিক যুগের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়।

কাশ্মিরি মুসলমানরা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামকে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত করেছেন। মুসলিম যুব-সমাজের দুই প্রজন্মকে দৃঢ় ঐক্যের ওপর জিহাদি ময়দানে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়েছেন। বাইরের শক্তির দিকে না তাকিয়ে নিজ পায়ে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

অভ্যন্তরেই দুশমনকে শক্ত হাতে আঘাত করার কৌশল অবলম্বন করেছেন তাঁরা। দীর্ঘদিন পূর্বে এদিকে ইঙ্গিত করে কাশ্মিরি যুবসমাজকে সম্বোধন করে সাইয়েদ মওদুদী বলেছিলেন, "আপনাদের জন্য না রুশ-আমেরিকান সাহায্য মিলবে আর না ব্রিটেন-ফ্রান্স আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে। সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মহান আল্লাহর ওপর নির্ভর করে নিজ বাহুবলেই সমস্যা সমাধানে ব্রতি হোন। মূলত এটাই সর্বশেষ ও সঠিক পথ।"

প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ার অন্যান্য স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে বর্তমান কাশ্মির স্বাধীনতা আন্দোলনের একটা মৌলিক মর্যাদা ও অবস্থানগত পার্থক্য বিদ্যমান। কেননা, এই আন্দোলন বহিঃশক্তির সহযোগিতা ছাড়া একটা লেচ্ছুর প্রকৃতির বিস্তারবাদের বিরুদ্ধেই চলছে। এবং বিগত দিনে বীরত্বের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ লক্ষ্য হাসিলে সক্ষম হয়েছে। আফগান জাতির মত সামরিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের অধিকারী না হয়েও কাশ্মিরি মুক্তি-সংগ্রামীরা যে অসীম সাহসিকতা ও বীরত্বের সাক্ষর রেখেছে, তা মুসলিম উম্মাহর ইতিহাসে চির ভাস্বর হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

হযরতবাল: প্রেরণার আরেক উৎস

ভারতীয় দখলদার সেনাবাহিনী হযরতবাল অবরোধ এবং সেখানে অগ্নিসংযোগ করে যে জঘন্য ঘৃণার্হ কাণ্ড ঘটিয়েছে, তা ভারতের নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করার সমতুল্য– এ কথা স্পষ্ট।

ভারতীয় বাহিনীর এই অমানবিক অভিযানের ফলে কাশ্মির স্বাধীনতা আন্দোলনে এক নতুন প্রাণ-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ডাল লেকের পশ্চিম তীরের ভাসমান বাগান ও নাসিমবাগের মধ্যে অবস্থিত এই দরগাহ-হযরতবাল দীর্ঘ কয়েক শতাব্দি থেকেই মুসলমানদের অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানিত স্থান হিসাবে পরিগণিত। আজ থেকে প্রায় তিন শতাব্দিকাল পূর্বে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে শ্রীনগরে মহানবী (স.)-এর পবিত্র চুল (মোয়ে মোবারক) আনয়ন করা হয়। যে দালানে এই পবিত্র চুল মোবারক সংরক্ষিত, তাকেই হযরতবাল বলা হয়। অনেকে মনে করেন, হযরতবাল বুঝি কোনও কথিত অলি-বুজর্গের মাজারই হয়ে থাকবে। আসলে কাশ্মিরি ভাষায় হযরতবাল মানে হল, হযরত (স.)-এর জায়গা। 'হযরত' বলতে নবী (স.) এবং 'বাল' বলতে স্থান বা জায়গা বোঝানো হয়। এই স্থান অতীব বরকতপূর্ণ ও কল্যাণকর বিধায় কাশ্মিরিগণ এটাকে দরগাহও বলে থাকেন।

ঐতিহাসিকদের মতে, ১০২৪ হিজরিতে নবী পাক (স.)-এর রওজা মোবারকের মোতাওয়াল্লি সৈয়দ আবদুল্লাহ কোরাইশি নবী (স.)-এর চুল মোবারক সঙ্গে নিয়ে হিন্দুস্থান আগমন করেন। তখন ছিল সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল। সম্রাট সৈয়দ আবদুল্লাহকে দক্ষিণ ভারতের বিজাপুরে জমিদারি প্রদান করেন এবং সেখানেই তিনি বসতি স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন পর শাহজাহান ও সৈয়দ আবদুল্লাহর তিরোধানের পর সম্রাট আওরঙ্গজেব জানতে পারলেন যে, সৈয়দ আবদুল্লাহর সন্তানদের সঙ্গে সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাই দারাশিকোর বন্ধুত্ব রয়েছে। এতে সম্রাট বিক্ষুব্ধ হয়ে সৈয়দ-সন্তানদের কাছ থেকে রাজকীয় সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাহার করে নেন। এই অবাঞ্ছিত ঘটনার কারণে সৈয়দ-সন্তানরা দারুণ আর্থিক সংকটের শিকার হয়ে পড়েন। ফলে তাঁরা দিল্লিতে নুরুদ্দিন নামক একজন কাশ্মিরি ব্যবসায়ীর কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে সৈয়দ-সন্তানরা ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে চুল মোবারক মিদানশ নামক গৃহভৃত্যসহ নিজামুদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করেন। ব্যবসায়ী নুরুদ্দিন চুল মোবারকের রক্ষী গৃহভৃত্য মিদানশসহ দিল্লি থেকে কাশ্মির আগমনের পথে লাহোরে সম্রাটের হাতে বন্দি হন এবং চুল মোবারক আজমিরে খাজা নিজামুদ্দিন-এর মাজারেই স্থাপন করা হয়। এই ঘটনার পর মোগল সম্রাটকে স্বপ্নযোগে নবী পাক (স.) নির্দেশ প্রদান করেন যে, তাঁর চুল মোবারক যেন ব্যবসায়ীকে কাশ্মিরে নিয়ে যেতে দেয়া হয়। ইতোমধ্যেই নুরুদ্দিন ইনতেকাল করেন। ফলে সম্রাট ভৃত্য মিদানশকেই পবিত্র চুল ফিরিয়ে দিলে তিনি তা নিয়ে কাশ্মির রওনা হন। চুল মোবারক কাশ্মিরে আনা হচ্ছে– এই খবরে উপত্যকার হাজার হাজার আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমান হীরাপুরা নামক স্থানে মিছিল

www.pathagar.com

সহকারে উপস্থিত হয়ে চুল মোবারক দেখেন এবং বিশ কিলোমিটার দূরে ডালঝিলের সন্নিকটে একটি মসজিদে এই চুল সংরক্ষণ করা হয়। তদানিন্তন কাশ্মিরের গবর্নর কাজেলখানের চেষ্টায় ওলামাদের পরামর্শে শ্রীনগরের এই স্থানে একটি স্বতন্ত্র দালান তৈরি করে সেখানেই স্থায়ীভাবে এই চুল মোবারক সংরক্ষিত হয়। তখনকার বিখ্যাত কবি মির্জা কলন্দর বেগের আবেগময়ী কবিতার ভাবার্থ মোতাবেক ঐ স্থান হযরত বাল বা নবীর (স.) স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরবর্তীতে এখানে মসজিদ ও ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করা হয়।

এই পবিত্র স্থান প্রতি বৎসর ঈদে মিলাদুন্নবী (স.), মেরাজুন্নবী (স.) এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের ওফাত ও শাহাদাতের দিন সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকে। কাশ্মিরি ঐতিহাসিকদের কাছ থেকে আরও জানা যায় যে, কবি মির্জা কলন্দর বেগ, শেখ রার্বো ও খাজা আহমদকেও নবী (স.) স্বপ্নযোগে এই পবিত্র চুলের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। এ ছাড়া আল্লামা সৈয়দ নেশাতী (র.) সহ বহু বুজর্গ এই চুলের সত্যতা ও বরকতের কথা বর্ণনা করেছেন।

শ্রীনগরের এই পবিত্রতম স্থান নিপীড়িত ও নির্যাতিত কাশ্মিরি মুসলমানদের প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়েছে। দখলদার বাহিনীর সীমাহীন অত্যাচারে জর্জরিত মুজাহিদরা এখানে এসেই স্বাধীনতার জন্য অকাতরে জানমাল বিসর্জন দেওয়ার শপথ গ্রহণ করে থাকেন। মুসলমানদের যাবতীয় কর্মতৎপরতার কেন্দ্র এই দরগাহ-হযরতবাল তাই আধিপত্যবাদী ভারতের মূল টার্গেট। এ জন্যই ১৯৬৩ সালের ২ ডিসেম্বর ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার কারসাজিতে রহস্যজনকভাবেই এই পবিত্র চুল মোবারক চুরি হয়ে যায়। ফলে কাশ্মিরসহ গোটা মুসলিম বিশ্বে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে এবং পণ্ডিত নেহেরু প্রথমবার এ কথা স্বীকার করেন যে, শেষ পর্যন্ত কাশ্মির ভারতের সঙ্গে থাকতে পারবে না। এ সুযোগে ভারত তার চিরশত্রু পাকিস্তানকে ঘায়েল করার লক্ষ্যে ঘোষণা করল, "এ কাজ পাকিস্তানের; কাশ্মিরে উত্তাপ ছড়ানোই তাদের উদ্দেশ্য।" এতে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হয়ে উঠল। নানা রকম গুজব ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বাংলাদেশ) হিন্দুদের মারা হচ্ছে– এই গুজবের প্রতিক্রিয়ায় কলকাতায় রক্তের বন্যা বয়ে গেল। মাত্র চারদিনের দাঙ্গায় সেখানে দুশ' নিহত, ছয়শ' আহত, তিয়াত্তর হাজার গৃহহারা এবং পাঁচহাজার দেশত্যাগে বাধ্য হন। সবকিছু হল একটা বানোয়াট কারসাজির ভিত্তিতে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, চুরি হওয়ার দু'মাস পর রহস্যজনকভাবে সেই চুল মোবারক পুনরায় যথাস্থানেই ফিরে আসে। এখনও এই ঘটনা রহস্যাবৃতই রয়ে গেছে।

দরগাহ-হযরতবাল অবরোধ ও অগ্নিসংযোগের এই দিন (২২ অক্টোবর) কাশ্মিরি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে। স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত এই উপত্যকার জনগণকে গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখার দিন ফুরিয়েছে। ভারতকে অবশ্যই এর খেসারত চড়ামূল্যেই দিতে হবে।

www.pathagar.com

কাশ্মির সমস্যার প্রকৃত সমাধান কোন পথে

ভূ-স্বর্গ কাশ্মির। পাহাড়ঘেরা উপত্যকা কাশ্মির। কাশ্মির সেই স্বর্গরাজ্য, যার অপ্রতিম নিঃসর্গ সৌন্দর্য মর্ত্যের অন্য কোথাও বিরল। তুষারমৌলী হিমালয় পর্বতমালা-বেষ্টিত কাশ্মির রাজ্য যেন বাত্যাক্ষুব্ধ লুদাখ, তিব্বত ও সিংকিংয়াংয়ের মাথার ওপরের ঘরে এমন এক সন্ধিস্থল, যেখানে দেখা হতে পারে একাধিক বিদেশি শক্তির। হাত বাড়াতে পারে কোনও একদিন। অস্থির চিত্তের কাশ্মিরি রাজা হরি সিং ডোগরা ছিলেন একজন দুর্বল চিত্তের লোক। সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম মানুষটা তাঁর অলস সময়টুকু ভাগ করে নিয়েছিলেন দু'ভাগে। শীতকালে জম্মুর প্রাসাদে বিলাস-ব্যসন ও আহার-ভোজন আর গ্রীষ্মকালে প্রাচ্যের ডেনিস বলে কথিত শ্রীনগরের ঝিলে প্রমোদ বিহার। ১৯৪৭ সালে উপত্যকার উপজাতীয় ও মুজাহিদদের সংগ্রামের মুখে ভীত-সন্ত্রস্ত রাজার শ্রীনগর ত্যাগের পূর্বে, ভারতের কংগ্রেস নেতাদের চাপের মুখে পথভ্রষ্ট হরি সিং-এর কাশ্মির রাজ্যের ভারতভুক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর, এখানে ভারতীয় আগ্রাসনের পথ সুগম করে দেয়। সেই থেকে কাশ্মির-সমস্যা দীর্ঘ চার দশক অবধি পাক-ভারত উপমহাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে প্রধান প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। এই সমস্যাকে নিয়ে পাকিস্তান ও ভারত তিন-তিনবার যুদ্ধের ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে। জাতিসংঘের মত বিশ্ব সংস্থায় ভারত কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আসছে। নিরাপত্তা পরিষদে প্রদত্ত পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর অঙ্গিকার তো বাস্তবায়িত হয়নি, গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নে জাতিসংঘ দারুণভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে পাক-ভারত একটা ধ্বংসাত্মক আণবিক যুদ্ধের মুখোমুখি অবস্থান করছে। এদিকে রাজ্যের সুসংগঠিত সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামও ব্যাপক জনসমর্থন লাভ করেছে। ভারত তার বিপুল সামরিক শক্তিকে বীভৎসভাবে প্রয়োগ করেও তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। স্বাধীনতাকামী মুসলিম মুক্তিযোদ্ধাদের দীপ্ত পদচারণা প্রতিরোধ করতে ভারতের বিভৎস অত্যাচারের কারণে ভূ-স্বর্গ কাশ্মির আজ ইতিহাসের ভয়াবহতম পরিস্থিতির সম্মুখিন। দীর্ঘ অর্ধশতাব্দির সংগ্রামের ফলে এই উপত্যকার নির্যাতিত জনগোষ্ঠি আজ স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে সমুপস্থিত। অপ্রতিরোধ্য এই আন্দোলন যতই জোরদার হচ্ছে, ততই এই সমস্যার সমাধানকল্পে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক শক্তির ভিন্ন ভিন্ন বিকল্প প্রস্তাবনা ও চিন্তা-ভাবনা সামনে আসছে।

মৌলিকভাবে কাশ্মির-সমস্যার সঙ্গে তিনটি পক্ষ সরাসরিভাবেই জড়িত।

১. কাশ্মিরি জনগণ: এই সমস্যার বুনিয়াদি ও আসল পক্ষ হল কাশ্মিরি জনগণ, যাদের ভাগ্যের ফয়সালা এ যাবৎ ভিন্নশক্তিই করে আসছে। বর্তমানে ভারতের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘাতে লিপ্ত কাশ্মিরি মুজাহিদরা দুইভাগে বিভক্ত। ক. হিজবুল মুজাহেদিন ও অন্যান্য পাকিস্তানপন্থী সংগঠনসমূহ। খ. জম্মু-কাশ্মির লিবারেশন ফ্রন্ট।

www.pathagar.com

হিজবুল মুজাহেদিন: ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত সংগঠনটি মূলত স্বাধীনতাযুদ্ধে লিপ্ত সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান। বলা যায়, হিজবুল মুজাহেদিন হল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণশক্তি। জম্মু-কাশ্মিরি জনগণের মধ্যে এই সংগঠনের কর্মি-সমর্থকই সবচাইতে বেশি এবং এটি অত্যন্ত সুসংগঠিত। ইতোমধ্যে এই সংগঠনের কর্মতৎপরতা গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতমুক্তি ও পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তিই হিজবুল মুজাহেদিনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। জম্মু-কাশ্মিরে গঠিত সর্বদলীয় স্বাধীনতা মোর্চা, যা গোটা রাজ্যের সকল রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম, এই রাজনৈতিক সংগঠন ও ইসলামি আদর্শ-চেতনার রাজনৈতিক লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হিজবুল মুজাহেদিনের কর্মতৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু।

জম্মু-কাশ্মির লিবারেশন ফ্রন্ট: কাশ্মির রাজ্যের ভারতমুক্তি ও স্বাধীনতার ব্যাপারে ফ্রন্ট অন্যান্য সংগঠনগুলোর সঙ্গে একমত হলেও এই সংগঠন কাশ্মিরের পাকিস্তানভুক্তির পক্ষে নয়। তাঁরা চান স্বাধীন ও সার্বভৌম কাশ্মির। এক সময় এই সংগঠনের কর্মতৎপরতা ও সশস্ত্র সংগ্রামই ছিল ভারতের মাথাব্যথার মূল কারণ। কিন্তু নেতৃত্বের কোন্দল ও মূল লক্ষ্যের সঙ্গে জনগণের ঐকমত্য না থাকার কারণে এই সংগঠন জনসমর্থন অব্যাহত রাখতে পারেনি। মূলত ইসলামি চেতনা-সমৃদ্ধ কর্মি ও কর্মতৎপরতার অনুপস্থিতিই তাঁদের জনসমর্থন হারানোর মূল কারণ। ফলে বর্তমানে ফ্রন্টের সশস্ত্র কর্ম-তৎপরতা সামান্যই বিদ্যমান।

২. **পাকিস্তান :** গিলগিত ও বলতিস্তানের মুক্ত এলাকাসমেত কাশ্মিরের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান দুনিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি অধ্যুষিত এই ভূ-খণ্ডের সীমান্ত ভারত ছাড়াও তিব্বত, আফগানিস্তান ও চিনের সঙ্গে সংযুক্ত। এছাড়া রাশিয়ার সঙ্গেও ভৌগলিক নৈকট্যে অবস্থিত। সিন্দু নদি ও চুনাব নদির পানি পাকিস্তানের জীবন নির্ভর; এই কাশ্মির থেকে নির্গত ও প্রবাহিত হয়ে পাকিস্তানে প্রবেশ করে পুরো এলাকার ভৌগলিক একাকিত্বের ঘোষণা করছে। সাতচল্লিশ-পূর্ব এই উপত্যকার সড়ক-জনপথ ও রেলপথসমেত সকল যোগাযোগ পাকিস্তানে এসেই মিলিত হত। কাশ্মির থেকে উৎসারিত প্রাকৃতিক ও সমতল এলাকার তাবৎ রাস্তা-ঘাটের নির্গমনও পাকিস্তানের দিকেই প্রবাহিত। পূর্বকালে কাশ্মিরের রসালো ফলের বাজার ছিল রাওয়ালপিন্ডি। কাশ্মিরের বন-জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ নদিপথে এসে পাকিস্তানের বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হত। সুতরাং পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মির উপত্যকার প্রাকৃতিক ও ভৌগলিক অবস্থান, রাজনৈতিক ও নৈতিক সম্পৃক্ততা স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত। কাশ্মির সমস্যার সঙ্গে জড়িত পক্ষগুলোর মধ্যে পাকিস্তান সরাসরিভাবে জড়িত দ্বিতীয় পক্ষ। পাকিস্তানের সরকারি দৃষ্টিতে কাশ্মির সমস্যা এখনও অমীমাংসিত। নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবাবলীর আলোকে পাকিস্তানের এই অবস্থানই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত। যে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হল, তা এখনও কার্যকর হয়নি। পাকিস্তানের যেহেতু নীতিগত ও নৈতিকভাবে একটা দৃঢ় অবস্থান আছে, সেহেতু কাশ্মিরি জনগণের সংগ্রামের নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থন দানকে পাকিস্তান জরুরি ও বৈধ মনে করে। আর জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নেও এর প্রয়োজন আছে বৈকি। মধ্যপ্রাচ্য

www.pathagar.com

যুদ্ধে জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নের জন্য যদি গোটা বিশ্বের তাবৎ রাষ্ট্র ওঠেপড়ে লাগতে পারে, তাহলে একই প্রতিষ্ঠানের মঞ্জুরকৃত কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব বাস্তবায়নে বাধা কোথায়? বিশ্বসংস্থা ও তার অধীন মানবাধিকার সংস্থাগুলোর এই বৈপরিত্য ও স্ববিরোধিতার কী হেতু থাকতে পারে?

৩. **ভারত:** ভারতীয় নেতৃত্বের দৃষ্টিতে ভারত হল এমন এক দেবিমাতা, যার মস্তক হল কাশ্মির রাজ্য আর শ্রীলংকা এই দেবির পদদ্বয়ের রূপ ধারণ করে ভারত মহাসাগরকে স্পর্শ করে। এদিকে দেবিমাতার বামহস্ত ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলোকে স্পর্শ করে, অন্যদিকে দেবির ডানহস্ত মরিশাস পর্যন্ত বিস্তৃত।

সুদীর্ঘ চার দশক অবধি ভারত কাশ্মির সমস্যা নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবেই টাল-বাহানা করে আসছে। অথচ ভারতই প্রথম নিরাপত্তা পরিষদের আশ্রয় নিয়েছিল সমস্যার সমাধানের নিমিত্তে। নিরাপত্তা পরিষদ যখন জম্মু-কাশ্মিরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে, তখনও ভারত তার কোনও বিরোধিতা করেনি। কিন্তু সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হতে থাকে। আসল রূপও প্রকাশ হতে থাকে। প্রহসনমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান ও ক্রীড়নক নেতৃত্ব সামনে এনে একথা বলতে থাকে যে, কাশ্মিরে একাধিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে; নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবও এখন অতীতের নিগড়ে আবদ্ধ। সুতরাং জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাব বাস্তবায়নের সুযোগও নেই, প্রয়োজনও ফুরিয়েছে।

উপরন্তু ভারত দ্বিতীয় যে অবস্থান নিয়েছে, তা হল, ভারতের সঙ্গে কাশ্মিরের অন্তর্ভুক্তি। মহারাজা হরি সিং ডোগরা ভারতের সঙ্গে কাশ্মিরের অন্তর্ভুক্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। সুতরাং অধিকৃত কাশ্মিরের অর্থাৎ কাশ্মির রাজ্যের অংশ বিশেষে গণভোট অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে ভারতের এ সব বক্তব্যের কোনও ওজন নেই; এটা বরং অত্যন্ত খোঁড়া যুক্তি ও স্ববিরোধিতা। কেননা ভারতের সঙ্গে যদি ডোগরা রাজার অন্তর্ভুক্তিকেই মেনে নেওয়া হয়, তাহলে বিশ্ব সংস্থায় দাঁড়িয়ে ভারতের পক্ষে কাশ্মিরে গণভোট অনুষ্ঠানের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কী অর্থ বহন করে। কোনও স্বাধীন দেশ কি তারই একটা অংশের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারে? এটা কি বিশ্ব জনমতের প্রতি সুস্পষ্ট প্রতারণা নয়? অধিকন্তু সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, কাশ্মিরি শাসক ডোগরা মহারাজার ভারতভুক্তি ঘোষণা ও সম্পাদিত চুক্তি ছিল একটা নির্জলা মিথ্যা নাটক। এলিস্টার ল্যাম্ব নামক একজন ইতিহাসবিদ কাশ্মিরের ভারতভুক্তির ঘোষণাকে সম্পূর্ণ বানোয়াট ও মিথ্যা বলে আখ্যা দিয়েছেন। এমতাবস্থায় এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, কাশ্মিরে ১৯৪৭-এর ২৭ অক্টোবর ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ ছিল অবিকল আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসনের সমতুল্য।

www.pathagar.com

দেশ তার নিজস্ব শাসন-সংবিধান ছাড়াই চলেছে। সুতরাং কাশ্মিরে স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্ভাবনাময় বিজয়ের এ পর্যায়ে সন্দেহ-সংশয় ও অস্পষ্টতা দূর করা দরকার। স্বাধীনতা প্রতিটি ব্যক্তি ও জাতির জন্মগত ও বুনিয়াদি অধিকার। অনস্বীকার্য এই অধিকার কেউ কারও কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না; পারে না দীর্ঘদিন যাবৎ এই মানবীয় মৌলিক অধিকার হরণ করে রাখতে। কোনও এলাকার মানবগোষ্ঠি যখন স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত হয়, তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় স্বজাতীয় চেতনা। তখন স্বাধীনভাবে বসবাস করার জন্য একে অন্যের সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যেতে পারে। এমন হাজারো দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। এইদিক থেকে কাশ্মির সমস্যার সমাধানে থার্ড অপশান বা পূর্ণ স্বাধীনতা অযৌক্তিক নয়। কাশ্মিরের পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে যে-সব উল্লেখযোগ্য যুক্তি প্রদান করা হয়:

ক. ভারত কখনোই কাশ্মিরের পাকিস্তানভুক্তি মেনে নেবে না।

খ. পাকিস্তানের অভ্যন্তরে জনগণ শোষণের শিকার। আর যেখানে শোষণ, সেখানে জাতিগত, বংশগত ও গোষ্ঠীয় ঝগড়া-বিবাদ নৈমিত্তিক হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কাশ্মিরি জনগণ কোন সাধে পাকিস্তানের অংশ হতে চাইবে।

গ. পাকিস্তান তার সৃষ্টির মৌল উদ্দেশ্য থেকেই বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। সুতরাং জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুপাতেই যখন দেশটি চলছে না, তখন কেন দীর্ঘ ত্যাগ-তিতীক্ষা ও সংগ্রামের বিনিময়ে প্রাপ্ত বিজয় পাকিস্তানের থলেতে ভর্তি হবে?

ঘ. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বক্তব্য রেকর্ড আছে যে, তিনি বলেছেন, আমাদের কাছে স্বাধীন কাশ্মিরের চাইতে তাকে পাকিস্তানের কাছে সোপর্দ করা অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা এটা ভারতের অভ্যন্তরে আরও বিশটা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে উৎসাহ যোগাবে আর আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হবে হুমকির সম্মুখিন।

অধিকৃত কাশ্মিরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মীর কাশেম তার আত্মজীবনীতে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ইন্দিরা গান্ধির ভূমিকাকেও অনেক ভারতীয় বুদ্ধিজীবী কড়া ভাষায় সমালোচনা করে থাকেন। অমৃতবাজার পত্রিকায় নিরদ চৌধুরী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাকে ভারতের পক্ষে ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মরহুম জুলফিকার আলী ভুট্টোও ভারতকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তোমরা যেভাবে বাংলাদেশ বানিয়ে দিয়েছ, তেমনি ভারতের প্রতিটি ঝাড়-ঝোপের পশ্চাতে এক একটি বাংলাদেশ লুকিয়ে আছে।" অর্থাৎ কিনা ভারতের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের মত আরও অনেক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে।

ভারত কাশ্মিরের স্বাধীনতা মেনে নেবে কি নেবে না– এটা সময়ের ব্যাপার। পাকিস্তান সময় ও পরিবেশ পরিস্থিতির অনিবার্য প্রয়োজনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ভারত এ যাবৎ কাশ্মিরকে তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু স্বীকার করেনি; এখনও কাশ্মিরকে ভারতীয় শাসন-সংবিধানের অধীনে রেখে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রতারণামূলক কথাবার্তার আশ্রয় নিয়ে আসছে। সুতরাং কাশ্মিরের পাকিস্তানভুক্তিকে ভারত কখনও মেনে নেবে না– এমন কথা

www.pathagar.com

সম্ভাব্য সমাধান: বিকল্প প্রস্তাবনা

কাশ্মির উপত্যকায় ভারত বর্তমানে অগ্নি ও খুনের যে ইবলিসি নৃত্য পরিচালনা করছে, তা এভাবে আর দীর্ঘদিন চলতে পারে না। এর কোনও না কোনও একটা সমাধান বের করতেই হবে। সম্প্রতি ভারতীয় প্রেস, পাকিস্তানের সাবেক ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রিগণ এবং বিভিন্ন বলয়-প্রভাবিত ব্যক্তিবর্গের ইশারা-ইঙ্গিতের ভাষায় কাশ্মির-সমস্যা সমস্যাধানের বিভিন্ন বিকল্প সমাধান-প্রস্তাব প্রকাশ পেয়েছে। যদিও এসব প্রস্তাবের অধিকাংশ পরবর্তীতে অস্বীকারও করা হয়েছে। পাকিস্তানের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ইশারা-ইঙ্গিতের ভাষাগুলো মূলত সে দেশের রাজনৈতিক প্রচার-সৌন্দর্যই বর্ধন করেছে মাত্র। তৃতীয় বিশ্বের সেক্যুলার মুসলিম নেতৃত্বের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট হল, তাঁদের প্রদেয় বক্তব্য-বিবৃতির অস্বীকৃতি অধিকতর নিশ্চয়তার জন্যই হয়ে থাকে। কখনও কখনও এসব নেতা কোনও বিশেষ ব্যাপার অধিকতর নিশ্চিতকরণের নিমিত্তেই অস্বীকৃতিমূলক বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করে থাকেন।

দীর্ঘকালীন এই সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানের যে সব প্রস্তাবনা প্রকাশ পেয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে নিম্ন বিকল্পগুলো সামনে আসে।

১. স্বাধীন ও সার্বভৌম কাশ্মির: কাশ্মির সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান প্রস্তাবসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান হল, কাশ্মির রাজ্যের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। জম্মু-কাশ্মির লিবারেশন ফ্রন্ট (JKLF) এই সমাধান-প্রস্তাবের প্রধান সমর্থক। ইদানিং মার্কিন ও ভারতীয় কিছু বুদ্ধিজীবী-মুখপাত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাষায় কাশ্মির সমস্যার সমাধানকল্পে কাশ্মিরি জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের জন্য কিছু দুর্লভ ব্যবস্থাপত্র প্রস্তাব করেছেন। পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম কাশ্মির প্রতিষ্ঠার 'পুরনো বোতলে নতুন শুরা' তার মধ্যে অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন সার্বভৌম কাশ্মির প্রতিষ্ঠার ওপর আলোচনা-সমালোচনা কম হয়নি। এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের পথে সমস্যা ও সম্ভাবনার ওপরও প্রচুর লেখালেখি হয়েছে। আজকাল এ প্রস্তাবকে 'থার্ড অপশান' নামেও অবিধিত করা হচ্ছে। কোনও জাতির ভবিষ্যত নির্ধারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যখন সমুপস্থিত হয়, তখন এ ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনার অতীব প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। যাতে করে অপেক্ষাকৃত উত্তম বিষয়কে গ্রহণ করা যেতে পারে। আফগানিস্তানের মুক্তিযুদ্ধ যখন চূড়ান্ত বিজয় পর্যায়ে সমুপস্থিত হয়, তখন স্বাভাবিকভাবে বিতর্ক শুরু হয় যে, অস্থায়ী সরকার কিভাবে গঠন হবে, কোন ধরনের নীতি প্রণীত হবে, কোন নীতিতে সরকার পরিচালিত হবে। কিন্তু কিছু নির্বোধ স্বজন আর কিছু বিচক্ষণ দুর্জনের চাপের মুখে অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের পরিণতি আজও আফগান জনগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পরও তার মূল উদ্দেশ্য-লক্ষ্য নিয়ে ইচ্ছাকৃত কিংবা অনিচ্ছাকৃত অস্পষ্টতা প্রনিধানযাগ্য। দীর্ঘ নয়টি বছর পাকিস্তানের মত একটা স্বাধীন

www.pathagar.com

যুক্তিযুক্ত নয়; বরং কল্পিত ধারণা। কিছু কিছু ভারতীয় চিন্তাবিদ–যার মধ্যে কীরণ সিং অন্যতম– কাশ্মিরকে পাঁচটা এলাকায় বিভক্ত করার কথা বলেছেন। ওভেন ডিক্সন চুনাব নদির তীর পর্যন্ত কাশ্মিরকে বিভক্ত করার প্রস্তাব রেখেছেন। কিন্তু ভারত সরকার তার পূর্ব-অবস্থানের কোনও পরিবর্তন করেনি। সুতরাং কী করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ভারত কাশ্মিরের পাকিস্তানভুক্তির চাইতে তার সার্বভৌমত্বকেই অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, হিন্দু-মুসলিম বৈরিতার ফলে হিন্দুস্থানের কেন্দ্রীয় শক্তি যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখনই মুসলিম শাসনে লর্ড ক্লাইভের আগমনের সুযোগ ঘটে, আর সারা ভারত জুড়ে ইংরেজ-কর্তৃত্ব ছড়িয়ে পড়ে। তেমনিভাবে আজও যদি কোন দুর্বল রাষ্ট্র পাক-ভারত উপমহাদেশে জন্ম নেয়, তার প্রতিরক্ষার জন্য বহিঃরাষ্ট্রের আশ্রয় নিতে হবে না– কে বলতে পারে! এর পরিণতিতে নতুন ক্লাইভের আগমন রোধ করবে কে? চিন-আমেরিকা দ্বন্দ্বের পটভূমিতে এই অঞ্চলে আমেরিকার আগমনের ব্যাপকতর সম্ভাবনা কী করে উড়িয়ে দেয়া যায়!

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় শোষণের ব্যাপারেও এ কথা বলা যায়, উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর নাগরিক অধিকার হরণ, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শোষণ একটা মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সামাজিক প্রেক্ষাপট বিচারে স্বাধীন রাষ্ট্র কাশ্মিরেও সেই একই শোষণ হবে না তারও কি গ্যারান্টি দেওয়া যেতে পারে? উপরন্তু ভারতের মত বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও গোষ্ঠিগত, জাতিগত ও শ্রেণীগত শোষণ দিব্যি চলে আসছে। ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ধর্মীয় ও বংশীয় তারতম্যের কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা অহরহ চলছে। পাকিস্তানেও চলছে অনুরূপ জুলুম-শোষণ। তারই পরিণতিতে পাকিস্তানকে দ্বিধা-বিভক্ত হতে হয়েছে। শোষণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ফলে এ সব দেশে সামাজিক অসন্তোষ ও অস্থিরতা বিদ্যমান। স্বাধীন কাশ্মিরের বলতি, লুদাখি, ডোগরা ও কাশ্মিরিদের মধ্যেও একই সমস্যা ও দ্বন্দ্ব হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

স্বাধীন কাশ্মির রাষ্ট্রের পক্ষে এ কথাও বলা হয় যে, এভাবে এটাকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে সুইজারল্যান্ড প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে ১৪১৫ সালে এক দীর্ঘ যুদ্ধের ইতিহাসও রয়েছে। এবং এলাকার সকল শক্তি ঐক্যবদ্ধভাবে তার পক্ষপাতহীনতার নিশ্চয়তা বিধান করেছে। ফলে সেখানে শক্তির ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। আমরা এখানেও যদি সুইজারল্যান্ডের নমুনা সামনে রাখি, তাহলে দেখা যাবে, এখানে শক্তির ভারসাম্যের দারুণ অনুপস্থিতি বিদ্যমান। একদিকে চিনের অবস্থান; যার উদীয়মান শক্তি সম্পর্কে ধারণা করা হচ্ছে যে, দু'হাজার বিশ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রধান বৃহৎ শক্তির রূপ ধারণ করবে। অন্যদিকে ভারতের অবস্থান; ইতোমধ্যেই যার বৃহৎ শক্তি হওয়ার প্রবল আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। এ জন্য চলছে ব্যাপক প্রস্তুতি। অন্যদিকে পাকিস্তানের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অবস্থান। কাশ্মির ছাড়া আরও দুর্বল হবে সে। এমনিভাবে শক্তির ভারসাম্য এই অঞ্চলে কীভাবে প্রতিষ্ঠা পাবে? সুতরাং সুইজারল্যান্ড পদ্ধতির গ্যারাান্টি যদি এখানেও প্রদান করতে হয়,

www.pathagar.com

তাহলে চিনকেও শামিল করতে হবে। কেননা চিনকে আস্থায় না এনে তারই দোরগোড়ায় একটি নবরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পরিণতি শুভ হবে না। চিন কি এমনতরো একটা অবস্থা গ্রহণ করার জন্য তৈরি আছে! এমন যদি হয়, প্রস্তাবিত স্বাধীন সার্বভৌম কাশ্মির রাজ্যের প্রতিরক্ষার কী হবে? প্রতিবেশী শক্তিশালী চিনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীন কাশ্মির তার প্রতিরক্ষার জন্য এই অঞ্চলের বাইরেরই কোন শক্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে; করতে বাধ্য হবে। এ কথা দিবালোকের মত উজ্জ্বল যে, এই প্রতিরক্ষার গ্যারান্টি একমাত্র আমেরিকাই দিতে পারবে। দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোয় কি আমেরিকার এই উপস্থিতি গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে? কাশ্মির ও লুদাখ থেকেই চিনের স্পর্শকাতর এলাকা (Soft under Belly) শুরু হয়। যেমনিভাবে উত্তর আফগানিস্তানের আমো নদি থেকে শুরু হয় রাশিয়ার স্পর্শকাতর ভঙ্গুর এলাকা। চিনের পরমাণু পরীক্ষাকেন্দ্র (NUCLEUS LOBNOR) এর অতি সন্নিকটেই অবস্থিত। চিনের স্পেস লাঞ্চ প্রোগ্রামের মনিটরিঙও লুদাখ থেকে অতি সহজেই সম্পন্ন হতে পারে। আন্তর্জাতিক শক্তির এই হিমালয়ান উপত্যকার প্রতি আগ্রহ ও আকর্ষণের হেতু সচেতন ব্যক্তির কাছে আজ আর অজ্ঞাত নয়। স্বাধীন কাশ্মির যদি লুদাখে আমেরিকাকে ঘাঁটি বানানোর অনুমতি দেয়, তাহলে এলাকায় নতুন করে দ্বন্দ্ব-বিবাদের সূত্রপাত হতে বাধ্য। এছাড়া এখানে চৌদ্দ হাজার ফুট উঁচু আকসাইচেন (Aksaichen) এলাকা অবস্থিত, যা লুদাখের সঙ্গে সংযোজিত ও তিব্বতের সিংকিয়াং-এর সঙ্গে সংযুক্ত। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, চিন তার দু'দুটি স্পর্শকাতর অংশের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত কাশ্মিরে ভিন্ন একটি বৃহৎ শক্তির আনাগোনা-অবস্থান কী করে মেনে নেবে! স্বাধীন কাশ্মির প্রতিষ্ঠার ধারণা নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবেরও পরিপন্থী। এখানে স্বাধীনতার পরিবর্তে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার কথাই বলা হয়েছে। সুতরাং স্বাধীন কাশ্মিরের জন্য জাতিসংঘে নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করতে হবে, যা আদৌ সম্ভব নয়। ভারত যেখানে নিরাপত্তা পরিষদে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালনে অনীহা প্রকাশ করে আসছে, সেখানে বর্তমান প্রস্তাবের ওপর বাতিল রেখা টেনে দিয়ে ভারতকে নতুন প্রস্তাব উত্থাপন করতে বললে সেই একই প্রতারণার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না, তার কী নিশ্চয়তা আছে! অধিকন্তু বর্তমান নতুন বিশ্বব্যবস্থার ইউনিপোলার সিস্টেমের অধীন সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ বৈরী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে রয়েছে। কাশ্মির সমস্যার ওপর গৃহীত প্রস্তাবকে পুরানো ঘোষণা করে নিরাপত্তা পরিষদের এজেন্ডা থেকে বাদ দেওয়ার পাঁয়তারা চলছে। এমতাবস্থায় নতুন রেজুলেশান গৃহীত হওয়ার কিঞ্চিৎ সম্ভাবনাও নেই। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাপক শক্তি রাতদিন যেখানে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প প্রচার করছে, সেখানে কাশ্মিরে দীর্ঘদিন যাবৎ মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ হয় না কেন? সুতরাং ইসলাম ও মুসলিম স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের ওপর আস্থা রাখার উপায় নেই। আর আমেরিকাও উত্থাপিত নতুন প্রস্তাবের সমর্থন করবে, তারও তো কোনও গ্যারান্টি নেই। সুতরাং স্বাধীন-সার্বভৌম কাশ্মিরে পাক-ভারত-চিন তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার কল্যাণের চাইতে ইউরোপ-আমেরিকার স্বার্থই নিহিত রয়েছে বেশি। আমরা ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, স্বাধীন কাশ্মির প্রতিষ্ঠার প্রবক্তারা মূলত আমেরিকান বলয়ের সঙ্গেই সম্পৃক্ত। ফলে তাঁরা আদর্শ

www.pathagar.com

চিন্তা-চেতনার দিক থেকে সেক্যুলার স্বাধীন কাশ্মিরই প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু প্রশ্ন হল, সেক্যুলার কাশ্মির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে বৃহৎ ধর্মনিরপেক্ষ ভারত থেকে মুক্তির কী প্রয়োজন? পক্ষান্তরে কাশ্মির সমস্যার সূত্রপাতের বুনিয়াদই তো হল যে, ভারত-বিভক্তির ফরমুলা মোতাবেক পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ করে দ্বিজাতি-তত্ত্বের ভিত্তিতে। এই মূলনীতির অধীনে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মিরও পাকিস্তানের অংশ হওয়ার কথা। নচেৎ স্বাধীনতার কোন ভিত্তিই থাকে না। সুতরাং কাশ্মির-স্বাধীনতার ভিত্তিই হল দ্বিজাতিতত্ত্ব। সে কারণে আজ পাকিস্তানের এ কথা বলার অধিকার রয়েছে যে, কাশ্মির-সমস্যা মূলত ভারত-বিভক্তির মূল এজেন্ডারই অসম্পূর্ণ অধ্যায়। এটা এখনও অমীমাংসিত, দ্বিজাতি-তত্ত্বের কাঠামোতেই ভারতমুক্ত করে কাশ্মিরকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

আমরা এবার পাকিস্তান সৃষ্টির ব্যর্থ উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করছি। মৌলিকভাবে পাকিস্তান একটি আদর্শ রাষ্ট্র। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতিতে ছিল পরিপূর্ণ। বলা হয় যে, মদিনা রাষ্ট্রের পর ইসলামি জীবনধারা প্রতিষ্ঠার জোরালো অঙ্গিকার নিয়ে প্রতিষ্ঠিত একমাত্র রাষ্ট্র পাকিস্তান। পাকিস্তানে বসবাসকারী ছাড়াও উপমহাদেশের অন্যান্য এলাকার মুসলমানরাও পাকিস্তান আন্দোলনে এই উদ্দেশ্যেই সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাশ্মিরি মুসলমানরাও এই আন্দোলনে অবদান রেখেছিলেন। পাকিস্তান শব্দ গঠনে 'ক' বা 'কাপ' অক্ষর কাশ্মিরের সঙ্গে সম্পর্কিত বিধায় পাকিস্তানের সঙ্গে এর সংযোগ অত্যন্ত নিবিড়। পাকিস্তানের অভ্যুদয় মূলত মুসলিম রেনেসাঁরই প্রথম ভিত্তি ছিল। আজকের বিশ্বে ইসলামি পুনর্জাগরণ আন্দোলনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রভাব একটা অনস্বীকার্য বাস্তবতা। কাশ্মিরের বর্তমান আন্দোলন ও তার ইসলামি চেতনাসম্পন্ন পরিচিতিও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলশ্রুতি।

এ কথা স্পষ্ট যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও শাসনব্যবস্থার মধ্যেকার বৈপরিত্য অবসানের পরিবর্তে দিন দিন ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। রাষ্ট্রীয় আদর্শ বহাল রয়েছে। আদর্শের সঙ্গে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার আত্মিক সম্পর্কও নিবিড়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে পাকিস্তানকে তার আদর্শের সঙ্গে একাত্ম হতে দেয়া হয়নি। এমনিভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভৌগলিক সীমান্ত ও আদর্শিক সীমারেখা পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। সে-দেশের শোষকগোষ্ঠিই এই উভয় অপূর্ণতার জন্য দায়ী। এই অপূর্ণতা আদর্শের ব্যর্থতা নয়, বরং সেই শাসন-শোষণের সমাজ-ব্যবস্থা দায়ী, যা গোলামি যুগ থেকে ক্রমাগত চলে আসছে। ক্ষয়িষ্ণু ও ভঙ্গুর সমাজব্যবস্থা পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ তথা গোটা উপমহাদেশের জনগণকেই হতাশ করেছে । করেছে অধিক সমস্যায় জর্জরিত। যতক্ষণ পর্যন্ত পাকিস্তান টিকে থাকবে, এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার আকুতি ও কাঙ্ক্ষিত ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। পাকিস্তানকে তার সঠিক লক্ষ্যপানে পৌঁছনোর চেষ্টা-প্রচেষ্টা যেমন অব্যাহত আছে, তেমনি যোগ্যতারও অভাব নেই। সুতরাং এক কথায় পাকিস্তান তার সৃষ্টির উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়েছে না বলে বলা যায়, এখনও পর্যন্ত তার সঠিক লক্ষ্যপানে পৌঁছনোর প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পাকিস্তান শুধুমাত্র পাকিস্তানবাসীর নয়, বরং উপমহাদেশের প্রতিটি মুসলমানের উত্তরাধিকার। এই দেশের প্রতি তাদের আবেগ-আকর্ষণ অবিতর্কিত। তাকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে দুর্বল করার প্রচেষ্টা শুধুমাত্র পাকিস্তান ও ইসলামের ক্ষতি নয়, বরং কাশ্মির, ভারত, বাংলাদেশ তথা পুরো দাক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জন্য অকল্যাণকর। মুসলিম উম্মাহ এতে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্যও শক্তির প্রয়োজন। উপমহাদেশে মুসলিম জনগোষ্ঠির শোষণমুক্তির জন্যও শক্তিশালী পাকিস্তান দরকার। সত্য কথা হল, পাকিস্তানকে তার আদর্শিক রঙে রঙিন করার পূর্ণ যোগ্যতা এর অভ্যন্তরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। তার আইন ও সংবিধান ইসলামি, নাম ইসলামি আর এই আদর্শ অনুযায়ী দেশ গড়ার আকুতি– সবই রয়েছে। এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়, কাশ্মিরি জনগণ যখন তাদের জিহাদি আন্দোলনে বিজয় লাভের পর আগুন ও খুনের দরিয়া সাতরিয়ে আসবে, তখন তারা পাকিস্তানকে যেমন সঠিক পানে প্রবাহিত করতে পারবে, তেমনি ফের ভূ-স্বর্গ বানাবে নতুন কাশ্মিরকে– নব চেতনায়, ইসলামি স্ফুরণে।

বলা হচ্ছে, পাকিস্তান তার অর্থনৈতিক স্বার্থে কাশ্মিরি স্বাধিকার আন্দোলনে সহায়তা দিচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান কাশ্মিরে অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছে। নিজের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে ভারতের সঙ্গে তিন-তিনবার যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। বলা হয় যে, কাশ্মিরের প্রতি সমধিক আগ্রহ ও দৃষ্টি প্রদানের কারণেই পাকিস্তানকে তার পূর্বাংশ (বাংলাদেশ) হাতছাড়া করতে হয়েছে। সত্যি, পাকিস্তান যদি কাশ্মিরের ব্যাপারে তার দাবি ও অবস্থান ত্যাগ করত, তাহলে এতদিনে অনেক উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হত। একটা গরিব দেশ হয়ে তার বাজেটের আটচল্লিশ ভাগ ব্যয় করছে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র কাশ্মিরের জন্য। ভারতের সঙ্গে কাশ্মির-বিরোধের কারণেই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের সমকক্ষ হওয়ার প্রয়োজনে আণবিক শক্তি অর্জনের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে পাকিস্তান। নচেৎ এত বিশাল সামরিকবাহিনী পালনের কী প্রয়োজন আছে! কাশ্মির যদি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণ ও ভিত্তি হয়, তাহলে পাকিস্তানও কাশ্মিরের অস্তিত্ব ও উন্নতির উপায়। কাশ্মির যেমন পাকিস্তানের পূর্ণতার জন্য প্রয়োজন, তেমনি পাকিস্তান কাশ্মিরের অস্তিত্বের গ্যারান্টিও বটে। সুতরাং কাশ্মির-পাকিস্তান একে অপরের পরিপূরক।

কাশ্মির-সমস্যা নিছক একটা ভূমি-সমস্যা নয়। এটা একটা জীবন্ত আদর্শের ব্যাপার। কাশ্মিরের পাকিস্তানভুক্তির বিপক্ষে আরও একটি খোঁড়া যুক্তি দেয়া হচ্ছে যে, এতে করে কাশ্মিরের পনের লক্ষ ডোগরা জনগোষ্ঠির কী হবে? কাশ্মির রাজ্যের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততা ও আত্মপরিচিতি খতম করা তাদের জন্য স্পষ্ট বোকামি ছাড়া আর কিছুই হবে না। সত্যি যদি এমন হয়, তা হলে যখন বর্তমান ভারত বিভক্ত হয়ে যাবে, যার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ভারতের অভ্যন্তরেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে, তখন ডোগরা সম্প্রদায় শুধু পাকিস্তান নয়, ভারতেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তাদের এক পাশে হবে পাকিস্তান, অপর পাশে থাকবে খালিস্তান। অথচ ভৌগলিকভাবে তাদের সকল সংযোগ

www.pathagar.com

হল পাকিস্তান ও কাশ্মিরের সঙ্গে। জম্মুর পথে আঠারো ঘণ্টায় করাচি পৌঁছা যায়। বোম্বাইর সঙ্গে তার তিনগুণ বেশি দূরত্ব। শিখদের স্বাধীন খালিস্তান প্রতিষ্ঠার অবস্থায় তো সমস্যা অধিকতর গুরুতর আকার ধারণ করতে পারে। সুতরাং ডোগরা সম্প্রদায়ের পাকিস্তানেই অধিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা থাকবে। ভারতে যেখানে বিশ কোটি মুসলিম অধিবাসীর কোন মূল্য নেই, সেখানে মাত্র পনের লাখ ডোগরার কী জীবনোপায় ও মর্যাদা হতে পারে! এ ব্যাপারে জম্মুর ডোগরা ও লুদাখের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য আইনগত নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্বতন্ত্র ধারা থাকতে পারে।

২. **বিভক্ত কাশ্মির:** কাশ্মির রাজ্যকে বিভক্ত করার মাধ্যমেও এই সমস্যার সমাধান করার নীতি বিবেচনা করা হয়। পাকিস্তান-ভারত দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও পারস্পরিক অঘোষিত সমঝোতার নিরিখে এই সম্ভাব্য প্রস্তাবকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। পাক-ভারত গোপন দূতালি আলোচনা এই নীতিকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খাচ্ছে বলে একটা রটনা ব্যাপকভাবেই আলোচিত হয়। বিভক্ত কাশ্মির-নীতির এই সমাধান-প্রক্রিয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হল অধিকৃত কাশ্মিরের হিজবুল মোজাহেদিন সমমনা মুজাহিদ সংগঠনসমূহ এবং উভয় কাশ্মিরের ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলসমূহ। এসব দল মুসলিম ঐক্যের স্বার্থে এই বিভক্তি প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। মুসলিম উম্মাহর অনৈক্য ও বিভক্তির দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি আজ এই জাতি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে। ভারত তার অধিকৃত জম্মু কাশ্মির রাজ্যে এই উদ্দেশ্যেই বিকল্প তাবেদার রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে। জামায়াতে ইসলামী ও হিজবুল মোজাহেদিনকে এই উদ্দেশ্যেই বিলীন করার প্রচেষ্টা চলছে অত্যন্ত জোরালোভাবে।

প্রকৃত ব্যাপার হল, কাশ্মির রাজ্যের বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়া না কাশ্মিরি জনগণের জন্য কল্যাণকর আর না পাকিস্তানের জন্য। হিন্দুস্থানও এতে লাভবান হবে না। চিন অবশ্য বিষণ্ন হবে এতে। পূর্ব থেকেই সে তিব্বত ও হংকং সমস্যার সমাধান নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। উপরন্তু নতুন একটা সমস্যায় জড়িত হওয়া চিনের জন্য সুখকর নয়। সুতরাং এমন যে কোন পরিকল্পনা– যা কাশ্মিরকে বিভক্ত করবে এবং জাতিসংঘের গৃহীত রেজ্যুলেশানের কাঠামো থেকে বিচ্যুত হবে– কোনও মতেই আশংকামুক্ত নয়। হিন্দুস্থান যদি আজ কাশ্মিরে ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধেও লিপ্ত হয়, 'জাতিসংঘের রেজ্যুল্যাশান' পাকিস্তানের জন্য একটা নৈতিক সমর্থন যোগাবে। আন্তর্জাতিক শক্তিও সরাসরি এ কথা বলতে পারবে না যে, কাশ্মিরের ওপর পাকিস্তানের ভূমিকা আইনত অবৈধ। কাশ্মির বিভক্তিকরণ প্রক্রিয়াও বিশেষ কোন একটা মূলনীতি বা প্রস্তাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এটারও ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবনা বিবেচনা করা হয়।

ক. বর্তমান কন্ট্রোল লাইনকেই আন্তর্জাতিক সীমানা মেনে নিয়ে যেমন আছে তেমনই রেখে কাশ্মির-বিভক্তি কার্যকর করা।

খ. উত্তর এলাকা এবং বর্তমান আজাদ কাশ্মির পাকিস্তানকে স্থায়ীভাবে দিয়ে দেওয়া এবং জম্মুকে ভারতে হস্তান্তর করে উপত্যকাকে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যের মর্যাদা

www.pathagar.com

প্রদান করা। এই বিভক্তিকরণ নীতি মূলত ষড়যন্ত্রমূলকভাবেই কামিয়াব হতে পারে। এই মূলনীতি প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মিরের জনবিচ্ছিন্ন শাসক শ্রেণীর সমর্থন লাভে সক্ষম হতে পারে। কেননা এতে তাদের গোষ্ঠিস্বার্থ সংরক্ষিত হবে।

৩. **ট্রাস্টিশিপ:** পুরো এলাকা অর্থাৎ জম্মু ও কাশ্মির উপত্যকাকে ভারত ও পাকিস্তানের কব্জা থেকে উদ্ধার করে পাঁচ অথবা দশ বছরের জন্য জাতিসংঘের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে এই সমস্যার একটা সমাধান আসবে বলে বিবেচনা করা হচ্ছে। জম্মু-কাশ্মির লিবারেশন ফ্রন্টের সভাপতি আমানুল্লাহ খান সম্প্রতি এই প্রস্তাবনার পক্ষে সম্মতি প্রকাশ করেছেন। অতীতে ফিলিস্তিন-সমস্যার সমাধানও একই ট্রাস্টিশিপের অধীনে করার চেষ্টা চলেছিল। কোনও একটা দেশের ওপর জাতিসংঘের কব্জার কী অর্থ থাকতে পারে– তা আজ আর অস্পষ্ট নয়। বিশেষ করে, দুনিয়া শীতল যুদ্ধের ছায়ামুক্ত হওয়ার পর এখন আমেরিকার একক শক্তির ছায়াতলে আবদ্ধ। নতুন বিশ্বব্যবস্থার অধীনে বর্তমান জাতিসংঘ মূলত আমেরিকারই অপর নাম হিসাবে রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং কাশ্মির উপত্যকাকে জাতিসংঘে হওলা করার অর্থই হল আমেরিকার হাতে তুলে দেওয়া। আর এই তুলে দেওয়ার পরিণতি কারও কাছেই অজ্ঞাত নয়।

এই ট্রাস্টিশিপ প্রস্তাবকে অভিজ্ঞমহল একটা হাস্যকর প্রস্তাব বলে মনে করেন। কেননা ছোট্ট একটা দেশ নামিবিয়া জাতিসংঘের ট্রাস্টিশিপের দ্বারা কী রকম উপকৃত হয়েছে– তা আজ সবার জানা। কাশ্মিরে এই দীর্ঘ মেয়াদি ট্রাস্টিশিপ-কৌশলের অন্তরালের ভাবধারাই বা কী– তা স্পষ্ট। দীর্ঘ দশ বছরকাল জাতিসংঘের ট্রাস্টিশিপের অধীনে একটা জাতিকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে কি এ জন্যই যে, তারা এখনও এই অধিকার ভোগ করার যোগ্য হয়নি!

৪. **অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন:** ভারতের শাসনাধীন কাশ্মিরকে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রলোভন দীর্ঘদিনের। পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ ও মুদ্রা বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয় প্রদেশের হাতে ন্যস্ত করে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মাধ্যমে সুদীর্ঘকালের এই সমস্যা সমাধানের কথা বলা হচ্ছে। কাশ্মিরি জনগণের স্বাধিকার আন্দোলন যতই শক্তি সঞ্চয় করছে, ভারতীয় প্রচারমাধ্যমগুলো এই প্রস্তাবনা নিয়ে ততই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চালাচ্ছে।

হিন্দুস্থান জম্মু ও কাশ্মিরে প্রহসনমূলক নির্বাচন করেছে। আর নির্বাচনী নাটকের কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রেখেছে শেখ আবদুল্লাহর পরিবার ও তাঁর ন্যাশনাল কনফারেন্সকে। প্রত্যেক নির্বাচনী প্রচারাভিযানে কাশ্মিরের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতি নির্বাচনী শোভা বর্ধন করেছে মাত্র। অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের পাতা ফাঁদে কাশ্মির-নেতা শেখ আব্দুল্লাহ বার বার পা দিয়েছেন। শেখ আব্দুল্লাহর ব্যক্তিগত বন্ধু, কংগ্রেস সভাপতি ও ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু শেখ সাহেবকে কাশ্মিরের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের টোপ দিয়েই কাশ্মিরি জনগণের দীর্ঘকালীন সংগ্রামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতায় প্ররোচনা যুগিয়েছেন। কিন্তু শেখ সাহেব যখন মুখ্যমন্ত্রী পদে সমাসীন হয়ে প্রিয় বন্ধুর দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের দাবি করেন,

www.pathagar.com

তখনই বন্ধুর আসল রূপ প্রকাশ পায়। এবং অচিরেই শেখ সাহেবকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। দীর্ঘদিন কারাবাস যাপনের পর তিনি ভারতের পূর্ণ আধিপত্য মেনে নিয়ে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসন দাবি থেকে চ্যুত হবার পর পুনরায় মুখ্যমন্ত্রিত্বের তাজ পরিধান করেন। উপরন্তু ভারতীয় সংবিধানে কাশ্মির রাজ্যের যে একটা বিশেষ মর্যাদার ধারা সংযোগ করা হয়েছিল, তাকে বাতিল করে 'প্রধানমন্ত্রী'র স্থলে অঙ্গ রাজ্যের 'উজিরে আলা'র মর্যাদা দেয়া হয়।

আবার কাশ্মিরে সেই একই নির্বাচনী নাটক মঞ্চস্থ হয়ে গেল, সেই একই পরিবারের সুপুত্র (!) ফারুক আব্দুল্লাহ'র প্রধান চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে। এবারও অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের টোপ দিতে কসুর করেনি ভারত। বেয়নেটের ছত্রছায়ায় ফারুক আব্দুল্লাহ মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ গ্রহণের অর্ধ-মাসের মধ্যেই ভারতীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বারবার কাশ্মিরের স্বায়ত্তশাসন প্রসংগে প্রেসে আসার কারণে দারুণ অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

৫.গণভোট অনুষ্ঠান: কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার তথা গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপত্যকার দীর্ঘ অর্ধশতাব্দির এই সমস্যার সমাধান পাকিস্তানের সরকারি দাবি। পাকিস্তান এই সমস্যার সূচনালগ্ন থেকেই এই দাবি করে আসছে। আর জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদেও এই একই প্রস্তাব একাধিকবার গৃহীত হয়েছে। কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে ভারতের হঠকারিতাই প্রধান ও মূল প্রতিবন্ধক। উপরন্তু নতুন বিশ্বব্যবস্থা ঘোষণার পর পাশ্চাত্যের মুসলিম বিদ্বেষও আরেকটি বাধা। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে জনগণের রায় পাকিস্তানের পক্ষেই যাবে। সুতরাং এতে করে পাকিস্তান একটা মজবুত রাষ্ট্রশক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। মধ্য-এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে মিলে এশিয়া মহাদেশে পাকিস্তানকে একটা গুরুত্বপূর্ণ ও কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালনের পথে বাধা প্রদান করাই হিন্দু-ইহুদি চক্রান্তের যৌথ প্রয়াস বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এই কারণেই নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব সত্ত্বেও স্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘনের হাজারও ঘটনা জাতিসংঘের চোখে পড়ছে না। কাশ্মিরি মুসলমানরা যেন মানব নামের পদবাচ্যও নয়।

www.pathagar.com

সমাধান

উল্লেখিত পর্যালোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বস্তুত কাশ্মিরি জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রদানই হল এই সমস্যার প্রকৃত ও স্থায়ী সমাধান। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, অর্ধশতাব্দি অতিক্রান্ত হওয়ার পর ভারতকে এই পথে সমস্যার সমাধানে রাজি করানো অত সহজ নয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে একটা প্রশ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে, দীর্ঘ ৫০ বছর পর কেন আজ কাশ্মির-সমস্যার সমাধানকল্পে এতগুলো সম্ভাব্য সমাধানের বিকল্প পথ খোঁজা হচ্ছে? অর্ধশতাব্দিকাল অবধি এই সমস্যার সমাধান প্রস্তাবে উদ্বুদ্ধ একটি শব্দও প্রকাশ পায়নি কেন? প্রকৃত ব্যাপার হল, ভারতবিরোধী গণজোয়ারই আজ সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পদ্ধতি খোঁজার একমাত্র কারণ। সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, কাশ্মির সমস্যা সমাধানের একটাই এবং একমাত্র একটাই পথ, আর তা হল জিহাদ।

পাকিস্তান ও আজাদ কাশ্মির সরকারদ্বয়কে আজ এ কথা মেনে নিতে হবে যে, দুর্বলপক্ষকে আলোচনার টেবিল থেকে সবসময় শূন্যহাতেই ফিরে আসতে হয়। কাশ্মির-সমস্যার কাল্পনিক সমাধানের যতই সম্ভাব্য মত ও পথের কথা বলা হউক না কেন, শক্তিবিহীন পক্ষ শূন্য হাতেই থেকে যাবে। কাশ্মির উপত্যকায় জিহাদ যতই মজবুত ও শক্তিশালী হবে, সমস্যার সমাধান ততই সহজ ও নিকটতর হতে থাকবে। ১৯৪৮ সালে জিহাদি শক্তির প্রচণ্ডতা মোকাবেলায় টিকে থাকতে না পেরেই ভারত নিরাপত্তা পরিষদের আশ্রয় নিয়েছিল। আবারও সেই একই পথে জিহাদি শক্তির প্রচণ্ডতায় দিশেহারা ভারতকে পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদের আশ্রয় নিতে হবে। আর এই মুজাহিদ দল হবে আটচল্লিশের তুলনায় হাজার গুণ সচেতন ও শক্তিশালী। কে না জানে, আটচল্লিশে নিশ্চিত বিজয়ের দিকে অগ্রসরমান মুজাহিদ বাহিনীকে নিরাপত্তা পরিষদের দোহাই দিয়েই অর্ধশতাব্দিকাল গোলামির শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা হয়।

সংযুক্তি চুক্তি হতে পারে

কাশ্মির রাজ্যের পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্তি সম্পর্কে যাবতীয় সন্দেহ-সংশয় দূর করার জন্য একটি অন্তর্ভুক্তি চুক্তি সম্পাদন করা যায়। পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের মত নিছক একটা প্রদেশের মর্যাদার চাইতে অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসিত কাশ্মির হওয়াই বাঞ্ছনীয়। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয় কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকি ক্ষমতা রাজ্যের হাতে ন্যস্ত করার গ্যারান্টি অর্জন করা যায়। এ কথা সত্য যে, কাশ্মির রাজ্যকে পাকিস্তানভুক্ত করে সে-দেশের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্দশা ও দুরাবস্থার অংশিদার হওয়া কোনও মতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। পাকিস্তানের রাজনীতি ও প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য কদর্যতা বিদ্যমান। এ জন্যই কাশ্মিরি জনগণের পাকিস্তানের সঙ্গে শর্তসাপেক্ষ সংযুক্ত হওয়া উচিত। একটা সংযুক্তি-চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হউক। এই চুক্তিতে ভারতীয় সংবিধানে কাশ্মির রাজ্যকে তিনশত সত্তর নাম্বার ধারার অধীনে দেওয়া মর্যাদা ও ক্ষমতার চাইতে আরও অধিক পরিমাণ মর্যাদা ও ক্ষমতা দিতে হবে।

www.pathagar.com

স্বাধীনতা যুদ্ধের সুদীর্ঘ রক্ত-নদি অতিক্রম করে কাশ্মিরি জনগোষ্ঠি যখন পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হবে, স্বাভাবিকভাবেই সেখানে ইসলামি জীবনাদর্শভিত্তিক সমাজ ও শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলবে। আর এই আদর্শই তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল চেতনা। স্বাধীনতা যুদ্ধে কাশ্মিরি জনগণের অকুণ্ঠ ত্যাগ ও কোরবানির এটাই দাবি যে, তারা সেখানে ইসলামি জীবনদর্শনভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। আর পাকিস্তানের অন্য প্রদেশগুলোও তাদেরকে অনুকরণ করবে। পাকিস্তানকে সঠিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করবে। এমনিভাবেই কাশ্মির একদিকে তার অভীষ্ট লক্ষ্য পাকিস্তানের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হবে, অন্যদিকে পাকিস্তানের শাসন-শোষণের আওতা থেকে দূরত্বে থাকবে, আর তাকে সত্যিকারভাবে ইসলামের দুর্গ হিসাবে প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

ভারতীয় মুসলমানদের কী হবে?

কাশ্মির স্বাধীন হলে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগোষ্ঠির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে– এ প্রশ্ন ভারতীয় লবি বার বার প্রচার করছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে এই প্রচারণা ব্যাপকভাবে চলছে যে, কাশ্মির যদি ভারতমুক্ত হয়, কাশ্মির-স্বাধীনতা সংগ্রাম যদি কামিয়াব হয়, তাহলে গোটা ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা থাকবে না। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মিরে সশস্ত্র আন্দোলন শুরু হওয়ার পূর্বে কি এখানে সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় পূর্ণ নিরাপত্তায় ছিল? মিরাট, ভাগলপুরের বিভৎস হত্যাযজ্ঞ মুসলমানদের নিরাপত্তাহীনতার স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। ভারত-বিভক্তির সময় কংগ্রেসের প্রচারনা ছিল, সংখ্যাগুরু এলাকা নিয়ে পাকিস্তান তো প্রতিষ্ঠা হবে, কিন্তু হিন্দুস্থানের অন্যান্য এলাকায় মুসলমানদের কী হবে? এরা ভারতে সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে আর তাদের কোনও নিরাপত্তা থাকবে না। আসল ব্যাপার হল, ভারত-বিভাগ না হলেও মুসলমানরা সংখ্যালঘুই থাকত। ভারত এবার কাশ্মিরের ব্যাপারেও সেই একই পুরাতন খোঁড়া যুক্তির পুনরাবৃত্তি করছে। ভারতে কি এখনও মুসলিম সংখ্যালঘু জনগণ চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে সংখ্যাগুরুর কাছে ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা পায়? সরকারি পদের দ্বার তাদের জন্য এখন কি বন্ধ নয়? কাশ্মির ভারতমুক্ত হলে ভারতের অন্যান্য এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠি এমন কোন সমস্যার সম্মুখিন হতে পারে, যা তারা ইতোপূর্বে ভোগ করেনি? তাদের নিরাপত্তাহীনতা আগে যেমন ছিল, এখনও তাই আছে, আগামিতেও তাই থাকবে। কাশ্মির স্বাধীন হলে এতে কোন হেরফের হবে না, যদি বিশ্ববিবেক ভারতকে মানবাধিকার লঙ্ঘনে বাধা না দেয়; মানবাধিকারকে সম্মান করার ব্যাপারে বাধ্য না করে।

www.pathagar.com

কারগিল: পরাজিত যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হচ্ছে

প্রায় এক দশক পূর্বে কাশ্মিরে যখন আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বেগবান হয়ে ওঠে, তখন ভারত এ আন্দোলন কঠোরভাবে দমনের প্রয়াস চালায়। এখানে নারি-নির্যাতন, হত্যা, গুম, সম্পদ লুণ্ঠন, ঘর-বাড়ি জ্বালানোর মত লোমহর্ষক ঘটনা অহরহ ঘটতে থাকে। গবর্নর গ্রীশচন্দ্র সকসেনা ও জগমোহনের 'Kill Kashmiries and save Kashmir' নীতির মাধ্যমে অবিরত মানবাধিকার ভূলণ্ঠিত হতে থাকে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব প্রকাশ্য ঘটনা এমন এক গণতান্ত্রিক দেশের রাষ্ট্রীয় শক্তির উদ্যোগে সংঘটিত হয়, যে রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের মানবাধিকার সনদে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বাক্ষর প্রদান করেছে। কাশ্মিরি জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রাম মূলত নিরাপত্তা পরিষদে স্বীকৃত মানবাধিকার সনদের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিশ্বের তাবত জাতিকে জাতিসংঘ এই অধিকার প্রদান করেছে। বলা বাহুল্য, এই অঞ্চলের জনগণকে অর্ধশতাব্দি পূর্বে তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি তো স্বয়ং বিশ্বসংস্থাই দিয়ে রেখেছে। ভারতের কাশ্মির-নীতির অন্যতম প্রধান দিক হল, মানবাধিকার লঙ্ঘনের এসব ঘটনা যাতে বহির্বিশ্ব অবগত হতে না পারে এবং জনগণের সংগ্রামের সঙ্গে বাইরের কোন শক্তি যেন সহানুভূতিশীল না হতে পারে। এজন্য আন্তর্জাতিক রেডক্রস ও এ্যামনেস্টি ইনটারন্যাশনালের মত মানবাধিকার সংস্থাগুলোকে কাশ্মিরে প্রবেশে বাধা প্রদান করা হয়। এছাড়া জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে ভারত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও গোষ্ঠিগত বিরোধ বলে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁরা স্থানীয় হিন্দু পণ্ডিতদেরকে তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসের মুখে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রমূলক উস্কানির মাধ্যমে কাশ্মির ত্যাগ করাচ্ছে। যাতে করে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করা যায় যে, এখানে আসলে স্বাধিকার আন্দোলন নয়, চলছে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস।

সাম্প্রতিককালে এক ব্যতিক্রমী ও দুঃসাহসী গেরিলা যুদ্ধের অবতারণা করেন কাশ্মির স্বাধীনতা যোদ্ধারা। আট হাজার থেকে আঠারো হাজার ফুট সুউচ্চ ও বরফাচ্ছাদিত পর্বতশৃঙ্গে অবস্থান নিয়ে যেভাবে তাঁরা পরাক্রান্ত শক্তিধর ভারতকে হেনস্তা করে ছেড়েছে, গেরিলা যুদ্ধের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। সর্বাধুনিক ও আণবিক অস্ত্রে সজ্জিত হিন্দুস্থানের মত প্রকাণ্ড শক্তির ঘাড়ে পা চেপে মুজাহিদরা ভারতকে নওয়াজ-ক্লিনটনের দ্বারস্থ হতে বাধ্য করেছে। নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত দুনিয়া-কাঁপানো এই যুদ্ধ এখন কারগিল যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ভারতের এই শ্বাসরুদ্ধকর ও দুর্বিষহ সংকটে ক্লিনটনের দূতালি ও নওয়াজ শরিফের অনুরোধে মুজাহিদবাহিনীর কারগিল ত্যাগ আর (মুজাহিদ কমান্ডারের ভাষায়) কৌশলগত কারণে অবস্থান পরিবর্তনকে ভারত তার নিরংকুশ বিজয় বলে দাবি করছে। এবং তাঁরা এই অভিযানকে 'অপারেশন বিজয়' নামে অভিহিত করেছেন। ভারতের নিজ ভূখণ্ড বলে প্রচারিত এই কারগিল বিজয়ের ঘোষণায় পাকিস্তানের সাবেক বিচারপতি এম.আর. কায়ানির সেই বিখ্যাত উক্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়, যা তিনি জেনারেল আইউব খানের সামরিক শাসন জারির পর সেনাবাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন। তিনি

www.pathagar.com

বলেছিলেন, I congratulate the army for successfully conquering their own country.(নিজ দেশকে সার্থকভাবে জয় করার জন্য আমি সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানাই।) নিজ ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারকে কেউ কি বিজয় বলে? এমন একটি প্রশ্ন ছিল ভারতের কংগ্রেস মুখপাত্র প্রবীণ রাজনীতিক প্রণব মুখার্জির। কারগিল থেকে পাকিস্তানি মদদপুষ্ট বলে ভারত কথিত মুজাহিদবাহিনীকে সরিয়ে দেওয়াকে ভারতীয় বাহিনীর সামরিক বিজয় বলে ধরে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায় যে, মুজাহিদরা কী করে দিনের পর দিন ভারতীয় প্রতিরক্ষাবাহিনীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ন্ত্রণরেখা অতিক্রম করল? কীভাবে দুর্গম পাহাড়ের বরফাচ্ছাদিত গিরিপথ দিয়ে টাইগারশৃঙ্গে আরোহন করল? কী করে দ্রাস, বাটাল্ক ইত্যাদি অঞ্চল দখল করে নিল? এ প্রশ্নও ছিল কংগ্রেস মুখপাত্রের।

কাশ্মির সংকট সমাধানে পাকিস্তান বরাবরই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তথা জাতিসংঘসহ তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা চেয়ে আসছে। অপর দিকে ভারত কোনও অবস্থায়ই তাকে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে চায়নি। এ কারণে ভারত তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতার ঘোর বিপক্ষে। প্রকৃতপক্ষে, কাশ্মির সমস্যার সমাধানে তৃতীয় পক্ষের সালিশ বা মধ্যস্থতার পূর্ণ অবকাশ খোদ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবাবলীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

ইতোমধ্যে কারগিল যুদ্ধের গ্যাঁড়াকলে আটকা দুর্বিষহ সংকটকালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের চূড়ান্ত মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালনে ভারত সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যের ফাঁপানো বেলুন সূচবিদ্ধ হয়ে চুপসে পড়েছে। এ ক্ষেত্রে কাশ্মির সমস্যাকে আন্তর্জাতিকিকরণের পাকিস্তানি প্রয়াস সফলতার দোরগোড়ায় উপনীত হলেও চূড়ান্ত সাফল্যের মুখ দেখেনি। অন্যদিকে ভারত পাকিস্তানের কাশ্মির সমস্যার আন্তর্জাতিকিকরণের প্রয়াসকে নস্যাৎ করার চেষ্টায়ও সফল হয়নি। ভারত কূটনৈতিক ও সামরিক-বেসামরিক দিক দিয়ে বিপুল পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতির বিনিময়ে কারগিল যুদ্ধের অবসান করতে সক্ষম হলেও মূলত কাশ্মিরের প্রতিটি বন-জঙ্গলে, অলি-গলিতে কারগিল যুদ্ধ নিহিত রয়েছে। সুতরাং মুজাহিদ কমাণ্ডার সালাহ উদ্দিন "এ ধরনের (কারগিল) যুদ্ধ এটাই শেষ নয়, শুরু মাত্র" বলে যে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন, তা আর অস্পষ্ট ও রহস্যাবৃত নয়, দিবালোকের মত স্পষ্ট।

কারগিল সংকট নিয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যকার তিন ঘণ্টার আলোচনা-বৈঠক ছিল চলমান বিশ্বের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের সেরা আলোচ্য বিষয়। এছাড়া কারগিলের মূল রহস্য উদঘাটনের লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাক-ভারত নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার জন্য উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তা জেনারেল জিমি ও উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিবসনকে দূত হিসাবে পাঠানোর ঘটনা, সমস্যা সমাধানে ক্রমবর্ধমান মার্কিন ভূমিকার প্রধান্যকেই স্পষ্ট করে তোলে। এছাড়া নওয়াজ শরীফের মাধ্যমে কারগিল থেকে মুজাহিদদের সরে আসার জন্য অনুরোধ জানানোর বিনিময়ে মি. ক্লিনটন নওয়াজ শরীফকে এই (মৌখিক) আশ্বাস প্রদান করেন যে, তিনি কাশ্মির সংকট নিরসনে অচিরেই ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

www.pathagar.com

এ ঘটনাপ্রবাহ– যা ভারতের ইচ্ছা-অনিচ্ছার তোয়াক্কা না করেই দ্রুত সংঘটিত হল– ভারতের কাশ্মির-নীতি, অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির সম্পূর্ণ বিপরীত। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতাকে সচেতন ভারতীয় জনগণ সে-দেশের কূটনৈতিক পরাজয় বলে হিসাব করেছেন। 'এশিয়া এজ'-এর ৯ জুলাই, ১৯৯৯ সংখ্যার সম্পাদকীয় ও ভারতের প্রগতিশীল বামজোটের বিশ্লেষণে কাশ্মির-সংকটের আন্তর্জাতিকিকরণকে পাকিস্তানের কূটনৈতিক বিজয় বলে প্রকাশ পেয়েছে। তাছাড়া নিজ দেশের অভ্যন্তরে মিগ-২১ ও গানশীপ হেলিকপ্টারের বোমা নিক্ষেপ তো আর সে দেশের লোকচক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত হয়নি! এরই মধ্যে কাশ্মিরের ইণ্ডিয়ান সেনাকমাণ্ড এক ট্রাজি-কমেডির অবতারণা করে রীতিমত হাস্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। জনৈক সেনা সদস্যকে কারগিল যুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মরণোত্তর 'পরম বীরচক্র' খেতাবে ভূষিত করার পর আবিষ্কৃত হল 'পরম বীরচক্র' সুস্থ শরীরেই জীবিত আছেন।

সারকথা হল, কূটনীতির সূক্ষ্ম চালবাজি হোক কিংবা বিপুল সমর-সম্ভারের বিভৎস ব্যবহার হোক, কাশ্মির রাজ্যে মূলত পেশি-শক্তি ব্যাবহার ছাড়া ভারতীয় বক্তব্যের অন্য কোনও যৌক্তিক ও মৌলিক ভিত্তি নেই। অপরপক্ষে পাকিস্তানের বক্তব্য নৈতিক ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

এতদসত্ত্বেও পাকিস্তান তার নৈতিক ও যৌক্তিক বলের তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলেছে। যথাসময়ের পারদর্শী সিদ্ধান্তকে সাহসিকতার সঙ্গে চূড়ান্ত লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়ার পথে কুণ্ঠাবোধ সে দেশের নীতি-নির্ধারকদের (রাজনীতিক) মামুলি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। '৪৭-এর উপজাতিবিদ্রোহ, '৬২-এর চিন-ভারত যুদ্ধ এবং '৬৫-এর অপারেশন জিব্রাল্টার পরিকল্পনায় পাকিস্তানের এই দুর্বলতা স্পষ্ট। আসলে পাকিস্তানের নৈতিক ও কূটনৈতিক সমর্থন অনেকটা বায়বীয় বাগাড়ম্বর।

আজ থেকে প্রায় ছয় দশক পূর্বে আল্লামা ইকবাল বলেছেন, "কাশ্মির মধ্য এশিয়ার একটা অংশ। যখন এই এলাকায় জাগরণ আসবে, তখন কাশ্মিরেও উত্থান সূচিত হবে।" মনে হচ্ছে, হিমালয় থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার যে সপ্নীল সুবাতাস বইতে শুরু করেছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের যে উর্মিমালার সৃষ্টি হয়েছে, তাকে স্তব্ধ করা কোনও অস্ত্র-শক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। কিছুদিন আগে কাশ্মিরের বারামুলা নামক স্থানে জনবসতির ওপর ক্র্যাকডাউনের সময় একটা পরিবারের নারী পুরুষ সবার ওপর অত্যাচার চলছিল। এমন সময় তিন/চার বছর বয়সের একটা শিশু লাফ দিয়ে খাটের ওপর দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করল, "আমরা কী চাই? আজাদি; এই আজাদির উৎস কী? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" মাসুম শিশুর উচ্চারিত শ্লোগান শুনে ফোর্স কমান্ডার বিস্মিত হয়ে পড়লেন। কমান্ডার বাচ্চাকে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে নিয়ে যান। ব্রিগেড কমান্ডার মুজাহিদের পরিবর্তে ছোট বাচ্চাকে ফোর্স কমান্ডারের কাছে দেখতে পেয়ে হতভম্ব। ব্যাপার কী? পুরো ঘটনা অবহিত হয়ে ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে অবস্থানরত সামরিক অফিসাররা বাচ্চাকে জিজ্ঞাসা করেন, বাচ্চা, কী বলছ তুমি? মাসুম শিশু একই শ্লোগান পুনর্ব্যক্ত করে বলে, "হাম কেয়া চাহ্‌তে? আজাদি; আজাদি কা মতলব কেয়া? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।"

সদ্য বুলিফোটা বাচ্চার মুখের শ্লোগান শুনে সেই দিনই পুরো আগ্রাসি বাহিনীর মসনদ

www.pathagar.com

প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। আর ব্রিগেড কমান্ডার স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে ওঠে, "যে জাতির শিশুরা জিহাদ আর আজাদির শ্লোগান মুখে নিয়ে কথা বলতে শেখে, সে জাতিকে দুনিয়ার কোন সৈনিক বা সমরাস্ত্র পরাভূত করতে পারে না। আমাদের সরকার অযথা সময় ক্ষেপণ করছে মাত্র। আমরা এখানে একটা পরাজিত যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করছি।" এ কথা আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, সত্যি, ভারত সরকার এই হিমালয়ান উপত্যকায় একটা পরাজিত যুদ্ধকে দীর্ঘায়িত করছে মাত্র। অবুঝ কাশ্মিরি শিশুর সাহস দেখে ইকবালের সেই কথারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে, 'তরবারির ছায়াতলে এসেছি আমরা পালনা হয়ে; নিশান মোদের চাঁদ সেতারা, হিম্মত মোদের ভয়ঙ্কর'। সবচাইতে আশার কথা হল, উপত্যকার যুবসমাজের দৃঢ় ও অটল এই সিদ্ধান্ত 'হাম আজাদি হাছিল কারকে রাহেঙ্গে'। কেবল রক্তের বিনিময়ে আসতে পারে এই আজাদি। এ কথা উচ্চারিত হয়েছে কবি আল মাহমুদের 'কাশ্মির' কবিতায়–

মানবিক বৃত্তির যা কিছু প্রাপনীয়, কিনে নিতে হবে রক্তের দামে।
যেমন কিনে নেয় মানুষের গুলীবিদ্ধ বুক সন্তানের স্বাধীনতা, গ্রামগুলোর সম্ভ্রম।
ভূস্বর্গে আগুন জ্বলছে। আর আমাকে কে যেন চোখ বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে
বধ্যভূমির দিকে–
তবুও কি অদম্য মানুষের স্বাধীনতার গান।
স্বাধীনতা, শব্দটি পারতপক্ষে এখন আর উচ্চার্য নয়।
স্বাধীনতা, এক উপত্যকাবাসীর ফিনকি দেওয়া রক্তের চিৎকার। লেকের ভেতর
প্রতিটি নৌকোয় এখন গুঞ্জরিত হচ্ছে কাশ্মীর। মনে হয় প্রতিটি বিষণ্ন মুখই
উদগীরণ করতে পারে বুলেট।
প্রতিটি যুবতীর বক্ষসুষমায় লুকিয়ে আছে বিস্ফোরক।
প্রতিটি কিশোরীর ইজ্জতের ওপর এখন রোপিত আছে স্বাধীনতার পতাকা।
অত্যাচারীর প্রতিটি রোমকূপ এখন আজাদীর রক্তে সিক্ত। স্বাধীনতা এখন
হাত বাড়িয়ে দেওয়া ইতিহাস
ইতিহাস এখন অপেক্ষমান কাশ্মীর।

www.pathagar.com

তথ্যপঞ্জি

১. Islamic culture in Kashmir
২. Memories of Babor
৩. Kashmir
৪. Travels
৫. সাপ্তাহিক নুসরাত, কাশ্মির সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯
৬. তা'রিখ তাহরিকে ইসলামি কাশ্মির, লেখক: আশেক কাশ্মিরি
৭. জাসারত, ফ্রাইডে স্পেশাল, করাচি ১৯৯৩
৮. History of Kashmir
৯. মসলা কাশ্মির: ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ, ইসলামাবাদ
১০.কাশমকাশ : চৌধুরী গোলাম আব্বাস
১১. আতশচুনাড় : শেখ আব্দুল্লাহ
১২. কাশ্মির আজাদী কী জেদ্দোজেহেদ: ইনস্টিটিউট অব পলিসি স্টাডিজ, ইসলামাবাদ
১৩. প্রেমনাথ বজ্জাজ
১৪. দৈনিক জাসারাত, করাচি, ১৬ সেপ্টেম্বর
১৫. মসলা কাশ্মির কী বারে মে ভারতি ওয়াদে: অধ্যাপক ধিরেন্দ্রনাথ শর্মা, নতুনদিল্লি
১৬. তাহরিকে পাকিস্তান কি সিয়াসত: ড. মো. সরওয়ার আব্বাসি, আজাদ কাশ্মির বিশ্ববিদ্যালয়
১৭. মতায়ে জিন্দেগি: সরদার মোহাম্মদ ইব্রাহিম খান
১৮. তাহরিক-ই-হুররিয়াত কাশ্মির প্রকাশনী, মুজাফফরাবাদ
১৯. Raider in Kashmir: Maj. Gen. Akbar Khan
২০. My Version: Gen. Musa Khan
২১. The Dangers of Hindu Imperialism, Lahore 1941
২২. While memory serves: LFG France Taker, London 1950
২৩. সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, নবেম্বর ১৯৯১
২৪. মসলা কাশ্মির কাল আজ আউর কাল: IPS
২৫. মসলা কাশ্মির কা পোর আমন হল: মীর আবদুল আজিজ
২৬. আইপিএস সেমিনারে ড. আইউব ঠাকুরের বক্তৃতা
২৭. পাক্ষিক জেহাদ কাশ্মির-এ প্রকাশিত প্রবন্ধ: জেনারেল হামিদ গুল
২৮. কাশ্মির মে হাওয়াতিম কি বেহুরমাতি: শাবনাম কাইউম, শ্রীনগর
২৯. ঝিলাম নদীর দেশ: বুলবুল সরওয়ার

www.pathagar.com

ওদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনারা– এ কান্না এ-জন্য নয়। বোনের সম্ভ্রম লুণ্ঠনের কারণেই গগনবিদারী আর্তনাদ

হায়, আমাদের অশ্রুধারা যদি প্লাবন হয়ে খড়কুটোর মত ভেসে নিয়ে যেত ওদের

www.pathagar.com

আবৃত সম্ভ্রমহারা চেহারা : স্বজনদের সান্ত্বনা

সম্ভ্রম হারানোর এই বেদনা আমৃত্যু পীড়া দেবে তাকে

www.pathagar.com

স্বজন হারানো শোকের কালো ছায়া এভাবেই আচ্ছাদিত করে তাদের

কাশ্মিরের প্রতিটি ঘরের দৃশ্য আজ এ রকম কেন– ভারত সরকারের জবাব আছে কি?

www.pathagar.com

যে সব মা তাদের নিষ্পাপ ছেলের আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনে, তাদের কান্না এমনই হয়

ফৌজি বর্বরতার শিকার মুসলিম যুবতীদের কাছ থেকে রিপোর্ট নিচ্ছেন জনৈক মানবাধিকর কর্মি

www.pathagar.com

হাসপাতালের রোগীরাও রেহাই পায়নি এসব বর্বরদের হাত থেকে

বাচ্চাকে বুটের তলায় রেখে আমার সম্ভ্রম লুঠে নিয়েছে ওরা

www.pathagar.com

আমার সম্ভ্রম লুণ্ঠনের জন্য ওরা **আমার বাচ্চাকে বন্দুকের নলের** আঘাতে জর্জরিত করেছে

ভারতীয় **নিরাপত্তা** প্রহরীর(!) লোলুপ দৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার প্রার্থনা

www.pathagar.com

সম্ভ্রমহারা এসব নারীর করুণ অ র্তি কি বিশ্বের মুসলমানদের কাছে পৌঁছয় না!

পিতাকে জড়িয়ে কাঁদছে সম্ভ্রমহারা এক কাশ্মিরি কন্যা

www.pathagar.com

জুলুমবাদ সরকারের বিরুদ্ধে মুসলিম ছাত্রীদের স্লোগান– হাম কেয়া চাহতা, আজাদি; আজাদি কা মতলব কেয়া হে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

ভারতীয় নির্যাতন সেলে বন্দি সন্তানদের মায়েদের করুণ আর্তনাদ

www.pathagar.com

এ রকমভারে প্রতিনিয়তই ওরা নির্যাতিত হচ্ছে পুলিশের হাতে

কোলের শিশুকে জিম্মি করে আমার ইজ্জত কেড়ে নেয়া হয়। ওরা আমাকে বলে, চিৎকার করলে তোর বাচ্চাকে খুন করা হবে।

www.pathagar.com

কাশ্মিরের প্রতিটি ঘর, প্রতিটি অলি-গলিতে একই মাতন, একই দৃশ্য

হায়েনার শিকার

www.pathagar.com

মা ও বেটির সম্ভ্রম লুণ্ঠিত হয়েছে একসাথে

অসহায়ত্ব ও নিরাপত্তহীনতার এক নির্বাক দৃষ্টি

www.pathagar.com

নাতজন কাশ্মিরির জন্য মোতায়েন রয়েছে একজন সৈন্য। সুতরাং পালাবার পথ কোথায়?

শুধু শহরের নয়, পার্বত্যাঞ্চলের বস্তিবাসী রমণীদের ইজ্জতও ওরা লুঠে নিচ্ছে যখন-তখন

এগুবার পথ নেই: সামনেই ভারতীয় পুলিশ

www.pathagar.com

এরা ধর্ষিতা। ওদের স্বামী, ভাইদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়

ভারতীয় সেনাদের দেয়া আগুনে ভস্ম হয়ে গেছে ওদের ঘর-বাড়ি। খোলা আকাশের নিচে তাদের ঠিকানা

www.pathagar.com

সম্ভ্রমহারা মুসলিম কন্যার আর্তনাদ

এখানে পুরুষের সঙ্গে সঙ্গে নারীদেরকেও হত্যা করা হয়

www.pathagar.com

তারা কি মানুষ, যারা মুসলিম নারীর প্রতি এমন পাষণ্ড হয়!

গণধর্ষণের শিকার এ-সব মুসলিম ললনা

www.pathagar.com

ওরা এভাবেই আমার বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে আমার কন্যাদেরকে ধর্ষণ করে

আর অশ্রু নয়, এবার বিদ্রোহ

www.pathagar.com

এক নজরে কাশ্মির

অবস্থান: এশিয়ার প্রাণকেন্দ্রে মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়ার [illegible] সম্পৃক্ত। তার চারদিকে আছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, [illegible]।

আয়তন: ছিয়াশি হাজার বর্গমাইল। [illegible] সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে আয়তনগত তুলনায় কাশ্মির [illegible] বড় এবং লোকসংখ্যার দিক থেকে [illegible]।

লোকসংখ্যা: পাকিস্তানে অবস্থানরত [illegible] প্রবাসীসহ এক কোটি ২০ লক্ষ।

মর্যাদা: অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ ও [illegible] ছিল। ব্রিটিশ আমলে ছিল অভ্যন্তরীণ [illegible]।

বর্তমান অবস্থান: ১৯৪৭ সালের দেশ-বিভাগের [illegible] রাজ্যের ৬৩ শতাংশ এলাকা ভারতের [illegible]।

বিরোধের কারণ: ভারত দাবি করে থাকে, [illegible] আর কাশ্মিরি জনগণ ভারতের এই দাবি [illegible]। পাকিস্তান এই দাবিকে চ্যালেঞ্জ করে। [illegible] আর না এটা আইনগত মনে করে।

সমাধান: অভ্যন্তর থেকে সকল বিদেশি [illegible] তত্ত্বাবধানে গণভোটের মাধ্যমে [illegible]।

বৃহদ-শক্তিসমূহের নীতি: কাশ্মির-বিরোধ [illegible] আমেরিকার পূর্ণ সহযোগিতায় [illegible] কাশ্মিরের ভবিষ্যত নির্ধারণের [illegible] হয়। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন [illegible] করেনি।। কিন্তু শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী [illegible] মাধ্যমে এই সমস্যা সমাধানের পথ [illegible]।

সম্ভাব্য সমাধান: অর্ধশতাব্দিকাল [illegible]

১. জনগণের স্বাধীন ভোটাধিকার [illegible]।

২. অবস্থা যেমন আছে তেমন [illegible] শিকার হতে দিয়ে স্বাধিকার [illegible] পথে চলতে দেওয়া আর উপমহাদেশে [illegible] দিনাতিপাত করতে দেওয়া।